সব জামাকাপড়ই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট, প্যাণ্ট, ফ্রক, তোয়ালে। দেখবেন, কি পরিষ্কার কি ধব্‌ধবে ফরসা হবে! সার্ফে কাপড় কাচার অতুলনীয় শক্তি আছে, তাই সহজেই ফরসা করে কাচা হয়। বাড়ীতে কাপড় সবচেয়ে ধব্‌ধবে ফরসা করে কাচায় সার্ফের জুড়ী নেই! আজই সার্ফ কিনুন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

SU. 24-X52 BG

কিলোর মাপে কিনুন

এখন সমগ্র দেশে মেট্রিক ওজনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক। পুরানো ওজন ব্যবহার করা বেআইনী।

মূল্যের পরিবর্তন তালিকা (সের থেকে কিলোগ্রামে)

নয়া পয়সা প্রতি সের থেকে নয়া পয়সা প্রতি কিলোগ্রাম

নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো	নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো	নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো	নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো	নঃ পঃ/সের	নঃ পঃ/কিলো
১	১	২১	২৩	৪১	৪৪	৬১	৬৫	৮১	৮৭
২	২	২২	২৪	৪২	৪৫	৬২	৬৬	৮২	৮৮
৩	৩	২৩	২৫	৪৩	৪৬	৬৩	৬৮	৮৩	৮৯
৪	৪	২৪	২৬	৪৪	৪৭	৬৪	৬৯	৮৪	৯০
৫	৫	২৫	২৭	৪৫	৪৮	৬৫	৭০	৮৫	৯১
৬	৬	২৬	২৮	৪৬	৪৯	৬৬	৭১	৮৬	৯২
৭	৮	২৭	২৯	৪৭	৫০	৬৭	৭২	৮৭	৯৩
৮	৯	২৮	৩০	৪৮	৫১	৬৮	৭৩	৮৮	৯৪
৯	১০	২৯	৩১	৪৯	৫৩	৬৯	৭৪	৮৯	৯৫
১০	১১	৩০	৩২	৫০	৫৪	৭০	৭৫	৯০	৯৬
১১	১২	৩১	৩৩	৫১	৫৫	৭১	৭৬	৯১	৯৮
১২	১৩	৩২	৩৪	৫২	৫৬	৭২	৭৭	৯২	৯৯
১৩	১৪	৩৩	৩৫	৫৩	৫৭	৭৩	৭৮	৯৩	১০০
১৪	১৫	৩৪	৩৬	৫৪	৫৮	৭৪	৭৯	৯৪	১০১
১৫	১৬	৩৫	৩৮	৫৫	৫৯	৭৫	৮০	৯৫	১০২
১৬	১৭	৩৬	৩৯	৫৬	৬০	৭৬	৮১	৯৬	১০৩
১৭	১৮	৩৭	৪০	৫৭	৬১	৭৭	৮৩	৯৭	১০৪
১৮	১৯	৩৮	৪১	৫৮	৬২	৭৮	৮৪	৯৮	১০৫
১৯	২০	৩৯	৪২	৫৯	৬৩	৭৯	৮৫	৯৯	১০৬
২০	২১	৪০	৪৩	৬০	৬৪	৮০	৮৬	১০০	১০৭

টাকা প্রতি সের থেকে টাকা প্রতি কিলোগ্রাম

টাঃ/সের	টাঃ/কিলো	টাঃ/সের	টাঃ/কিলো	টাঃ/সের	টাঃ/কিলো	টাঃ/সের	টাঃ/কিলো	টাঃ/সের	টাঃ/কিলো
১	১.০৭	১১	১১.৭৯	২১	২২.৫১	৩১	৩৩.২২	৪১	৪৩.৯৪
২	২.১৪	১২	১২.৮৬	২২	২৩.৫৮	৩২	৩৪.২৯	৪২	৪৫.০১
৩	৩.২২	১৩	১৩.৯৩	২৩	২৪.৬৫	৩৩	৩৫.৩৭	৪৩	৪৬.০৮
৪	৪.২৯	১৪	১৫.০০	২৪	২৫.৭২	৩৪	৩৬.৪৪	৪৪	৪৭.১৫
৫	৫.৩৬	১৫	১৬.০৮	২৫	২৬.৭৯	৩৫	৩৭.৫১	৪৫	৪৮.২৩
৬	৬.৪৩	১৬	১৭.১৫	২৬	২৭.৮৬	৩৬	৩৮.৫৮	৪৬	৪৯.৩০
৭	৭.৫০	১৭	১৮.২২	২৭	২৮.৯৪	৩৭	৩৯.৬৫	৪৭	৫০.৩৭
৮	৮.৫৭	১৮	১৯.২৯	২৮	৩০.০১	৩৮	৪০.৭২	৪৮	৫১.৪৪
৯	৯.৬৫	১৯	২০.৩৬	২৯	৩১.০৮	৩৯	৪১.৮০	৪৯	৫২.৫১
১০	১০.৭২	২০	২১.৪৩	৩০	৩২.১৫	৪০	৪২.৮৭	৫০	৫৩.৫৮

১ কিলোগ্রাম (১০০০ গ্রাম) = ৮৬ তোলা

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 61/[illegible]

INDIAN RAILWAYS

সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমায় সুন্দর রাখে'

সুন্দরী সাধনা বলেন, 'লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রঙ গুলোও আমার ভারী ভাল লাগে!'

LTS. 111-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

দেশবিদেশের খবরের জন্য

উইক্‌লী ওয়েস্ট বেঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬, টাকা; ষাণ্মাসিক ৩, টাকা।

কথাবার্তা—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বসুন্ধরা—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২, টাকা।

শ্রমিক বার্তা—শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা হিন্দী পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা।

পশ্চিম বংগাল—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগরেবী বংগাল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই;
(গ) ভি. পি. ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্‌ডিংস, কলিকাতা
এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

১
২
৩
৪

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

চতুর্বিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯

মির্জা আবু তালিব খাঁ

হুমায়ুন কবির

অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে অবসাদ দেখা দিয়েছিল। স্বভাবতই সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নতুন বিকাশের সম্ভাবনা সে সময়ে কম। তাই সে যুগে মির্জা আবু তালিবের মতন মনীষীর আবির্ভাব বিস্ময়কর। তিনি কবিতা লিখেছেন, কবিতার সংকলন ও সমালোচনা করেছেন। রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েও কিন্তু তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার হানি হয়নি। বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁকে শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে অন্যতম পথিকৃত বললেও অত্যুক্তি হবে না। রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ণয়ে সামুদ্রিক শক্তির তাৎপর্য তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, ভারতবর্ষে তাঁর পূর্বে কেউ করেনি, ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এরকম স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় বেশি মেলে না। ইংলণ্ডে তখন যে শিল্প-বিপ্লব চলছে, তার প্রকৃতিও তিনি অধিকাংশ ইয়োরোপীয় অর্থনীতিবিদ বা ঐতিহাসিকের চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। নিজে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ভিন্ন জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণসাধন অসম্ভব। ঐতিহাসিক পরম্পরায় সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন ও শক্তি কিভাবে কার্যকরী মার্কসের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তার বিবরণ আবু তালিবের রচনায় মেলে।

গত বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাসেল লেকচারে' আবু তালিবের সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করেছিলাম। তাই আজ তাঁর জীবন নিয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে লক্ষ্ণৌতে জন্ম হলেও তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বাঙলা দেশেই কেটেছিল। নবাবী দরবারে দলাদলি ও চক্রান্তের ফলে আবু তালিবের শৈশবেই তাঁর পিতা লক্ষ্ণৌ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। মুর্শিদাবাদের দরবারে তাঁর স্থান মেলে এবং চোদ্দ বছর বয়সে আবু তালিবও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। যৌবনপ্রাপ্তির

পরে কয়েকবার উত্তরপ্রদেশে কার্যোপলক্ষে গেলেও বারবার তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয় এবং সেখানে ১৭৮৭ সাল থেকে ১৭৯২ সাল, এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৭৯৯ সালে একজন ইংরেজ বন্ধুর আমন্ত্রণে আবু তালিব ইয়োরোপ যাত্রা করেন। আর্য়লণ্ড ও ইংলণ্ডে প্রায় তিন বছর কাটিয়ে তিনি ইয়োরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার অনেকগুলি দেশ ভ্রমণ করে ১৮০৩ সালের অগস্ট মাসে দেশে ফিরে আসেন। সে সময় তিনি যে রোজনামচা লিখেছিলেন, পরে তার সংশোধন করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বোধ হয় আবু তালিবের পূর্বে কোনো ভারতবাসী ইয়োরোপ এবং ইংলণ্ড নিয়ে ভ্রমণকাহিনী লেখেন নি। দেশে ফিরে আবু তালিব আবার উত্তরপ্রদেশে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যাত্রা করেন, কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। ১৮০৬ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, ভারতবর্ষের বর্তমান যুগের প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের অকাল-মৃত্যুতে দেশের কি ক্ষতি হল, সে কথা কেউ ভাবতেও পারে নি।

২

১৭৯১ সালে দেওয়ান-ই-হাফিজের এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করে আবু তালিবের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। হাফিজ পারস্য প্রতিভার অন্যতম দিক্‌পাল। বাঙলা দেশের অনেকেই জানেন না যে একবার গৌড়ের সুলতানের আমন্ত্রণে হাফিজ বাঙলা দেশে আসবেন স্থির করেছিলেন। আবু তালিবের সম্পাদিত দেওয়ান নতুন করে বাঙলা দেশের সঙ্গে ইরাণের যোগ স্থাপিত করল। সাহিত্য বিচারে কিন্তু আবু তালিবের খুলাসাত-উল-আফকার আরো বেশি স্মরণীয়। গ্রন্থখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের কাব্যসংগ্রহ করবার পরিকল্পনা বহুদিন থেকে তাঁর মনে ছিল এবং প্রায় পাঁচশো কবির রচনা একত্রিত করে তিনি সে সাধ এতদিনে পূর্ণ করলেন। সে যুগের হিন্দী কবিদের কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে আবু তালিব আরব কাব্যরীতির সঙ্গে হিন্দী কাব্যরীতির পার্থক্যের আলোচনাও করেছেন। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান বহু কবি সে যুগে ফারসীতে লিখতেন, কিন্তু আবু তালিবের মতে ব্রজভাষায় যাঁরা রচনা করতেন, তাঁরাই সংখ্যায় অধিক। সুমার্জিত ভাষার সমস্ত লক্ষণে সমৃদ্ধ ব্রজভাষা আবু তালিবকে মুগ্ধ করেছিল।

সাহিত্য বিষয়ে আবু তালিবের আরো অনেক রচনা রয়েছে, তাদের বিস্তারিত আলো-চনার আজ প্রয়োজন নেই। লণ্ডন শহরকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে কবিতা রচনা করেছিলেন, তার ইংরেজি অনুবাদ সে যুগের ইংরেজ পাঠকদের বিস্মিত করেছিল। তিনি ইয়োরোপ ভ্রমণের যে কাহিনী লিখেছিলেন, তার মধ্যেও বহু টুকরো কবিতা ছড়ানো। ইংলণ্ডে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এবং বিশেষ করে বান্ধবীরা তাঁর এ সমস্ত কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবু তালিবও ইংরেজ সুন্দরীর অনেক গুণগান করেছেন, কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে তাঁদের ভক্ত কবি বহুক্ষেত্রে বিখ্যাত ফারসী বা উর্দু কবিতার রূপান্তর করে তাঁদের মনোহরণ করতে চেয়েছেন। মুশায়েরাতে কবিকে যে তৎক্ষণাৎ কবিতায় কাব্যসম্ভাষণের উত্তর দিতে হয়, সে কথা জানতেন না বলেই হয়তো ইংরেজ ললনা আবু তালিবের ললিত রচনায় আরো বেশি আনন্দ পেয়েছেন।

৩

পূর্বেই বলেছি যে ১৭৯৯ সালে আবু তালিব ইয়োরোপ যাত্রা করেন। বারবার ভাগ্যাবিড়ম্বনায় তাঁর মন ভেঙে পড়েছিল। এমন সময় ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন বলে একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁকে বললেন যে তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন, আবু তালিব যদি তাঁর সঙ্গী হিসাবে যেতে স্বীকার করেন, তবে রিচার্ডসন তাঁর যাতায়াতের সমস্ত খরচ তো দেবেনই, তাছাড়া নৌ-যাত্রাপথে তাঁকে ভাল করে ইংরেজি শিখিয়েও দেবেন। আবু তালিব যে কিভাবে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের চিত্ত জয় করতেন, এ ঘটনা থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে নৌপথে এবং ইংলণ্ডে পেঁাছে যেখানেই তিনি গিয়েছেন, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি আদবকায়দা এবং চিত্তাকর্ষক কথাবার্তায় সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। জাহাজে তিনি যেভাবে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, তাও প্রশংসনীয়। ফলে বিলেতে পেঁাছে সেখানকার বিদ্বান বিদুষীদের সঙ্গে তিনি অকুণ্ঠভাবে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পেরেছেন।

সমস্ত বিষয় দেখবার ও জানবার অকুত আগ্রহ নিয়ে আবু তালিব ইয়োরোপ রওয়ানা হলেন। তিনি স্থির করলেন যে দেশান্তরে ভ্রমণের সময় যে সব উল্লেখযোগ্য জিনিস তাঁর চোখে পড়বে সব লিপিবদ্ধ করে দেশবাসীর চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানবর্ধন করবেন, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির রীতিনীতির বর্ণনায় ভারতবাসী অনেক কিছু শিখতে পারবে। বিশেষ করে শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞানে ইয়োরোপের মানুষ যে উন্নতি করেছিল তা জানলে ভারতবর্ষেও হয়তো তার প্রচলন করা সম্ভব হবে। তিনি ভ্রমণকালে যে রোজনামচা লিখেছিলেন, ১৮৬২ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে মির্জা হাসান আলী এবং মীর কুদরত আলী তা প্রকাশিত করেন। ইংরেজী অনুবাদ কিন্তু মূলগ্রন্থ প্রকাশিত হবার আগেই ১৮১০ সালে লণ্ডনে ছাপা হয়। ১৮১১ সালে ফরাসী এবং ১৮১৩ সালে জার্মান অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ১৮১৪ সালে নতুন ইংরেজী এবং ১৮১৯ সালে নতুন ফরাসী অনুবাদ দেখে বোঝা যায় যে আবু তালিবের বই কিভাবে ইয়োরোপীয় পাঠকের হৃদয় জয় করেছিল। দেশে কিন্তু বইখানির তেমন আদর হয়নি। প্রথম উর্দু তর্জমা এবং তাও অসম্পূর্ণ, ১৯০৪ সালে মোরাদাবাদে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যত দ্রষ্টার মত আবু তালিব তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন 'দেশবাসীর চরিত্রে যে আলস্য ও অনুদ্যম তাতে তাঁরা বোধ হয় আমার কথায় কান দেবেন না—আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

বাঙলা ভাষায় আজ পর্যন্ত আবু তালিবের ভ্রমণ কাহিনীর অনুবাদ হয়নি। দেড়শো বছরেরও আগে লেখা বইখানি থেকে কিন্তু আজো আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। ভারতবাসী সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঙালীর সম্বন্ধে বোধ হয় বলা চলে যে চিরাচরিত প্রথার বাইরে আমরা বড় একটা পা বাড়াতে চাই না। এমন কি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীও বাঁধাধরা রুটিনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে চায়। দুনিয়ার বিষয়ে উৎসুক্য নেই। চোখের সামনে হরেক রকমের গাছপালা পশুপাখি—ভারতবর্ষে এ বিষয়ে যত ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য তার তুলনা পৃথিবীতে খুব কমই মেলে—কিন্তু তবু আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বহুক্ষেত্রে প্রতিদিন দেখা গাছপালা পশুপাখির নাম জানে না, জানবার চেষ্টা করে না। পাঠ্যক্রমের বাইরে থেকে প্রশ্ন এসেছে বা গত কয়েক বছর যে ধরনের প্রশ্নপত্র প্রচলিত ছিল এবার তার ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে এ ধরনের অভিযোগ আমাদের দেশে হরদম শোনা যায়। এম-এ ক্লাশের পরীক্ষার্থীও তা নিয়ে অভিযোগ করে, প্রতিবাদ করে, আন্দোলন করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষক

বা অভিভাবকের সমর্থন পায় এ দৃশ্য ভারতবর্ষের বাইরে বোধ হয় আর কোথাও মিলবে না।

আবু তালিব খোলা চোখ এবং খোলা মন দিয়ে সবকিছু দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা করেছেন। আন্দামানের কাছে পৌঁছে দেখলেন যে দিগন্তে তটরেখা খালি চোখে দেখা যায় অথচ দূরবীন দিয়ে দেখতে চাইলে সবকিছু একাকার হয়ে জলের মধ্যে মিলিয়ে যায় সে রহস্য বোঝবার চেষ্টা তিনি করেছেন। কলকাতা ছেড়ে জাহাজ যত দক্ষিণে যায়, ধ্রুবতারা ধীরে ধীরে আকাশ প্রান্তে নেমে এসে অবশেষে বিষুবরেখায় একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল. দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে আবার বিষুবরেখা পার হয়ে তার দেখা পাওয়া যায়, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

আয়র্লণ্ডে জ্বালানী কাঠের বদলে 'পীট' পোড়ানো হয়, তা দেখে আবু তালিব বলেছেন যে কয়লার মতন উৎকৃষ্ট দাহ্য পদার্থ দ্বিতীয় নেই অথচ আমাদের দেশে রামগড়ে উৎকৃষ্ট কয়লা থাকা সত্ত্বেও আমরা কয়লা না জ্বালিয়ে গোবর জ্বালাই। ইয়োরোপে বা ইংলণ্ডে যে সব জিনিস তাঁর ভাল লেগেছিল, তিনি অকুণ্ঠভাবে তাদের প্রশংসা করেছেন. আবার দোষত্রুটি দেখাতেও দ্বিধা করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর মুক্তদৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করে। ইয়োরোপ সম্বন্ধে সব জিনিস তিনি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন, অভিমান অথবা ঈর্ষার কোনো চিহ্ন তাঁর রচনায় নেই।

ইংলণ্ডের বিষয় তিনি বলেছেন যে ইংরেজরা যেভাবে সমস্ত কাজে কল-কারখানার ব্যবহার করে, পৃথিবীর অন্য দেশে তার তুলনা মেলে না। কল-কারখানার দৌলতেই ইংলণ্ডের এত সমৃদ্ধি এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ইংরেজ যন্ত্রের ব্যবহার করে। বীজ থেকে তেল বের করা, শস্য মাড়ানো, আটা পেষা, জল তোলা, জল সরবরাহ করা প্রভৃতি কাজে তো যন্ত্রের ব্যবহার আছেই, এমন কি রান্নাঘরেও রান্নার কাজে যন্ত্র বাদ যায়নি, মুরগী রোস্ট করবার জন্যও এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র তারা উদ্ভাবন করেছে। মানুষ নিজের শক্তিতে যা পারে না, যন্ত্রের দ্বারা তা সুসাধ্য। মানুষ নিজের বাহুবলে যে বোঝা তুলতে পারে না, যন্ত্রের সাহায্যে অক্লেশে তা তোলে, দূরের অস্পষ্ট বস্তুকে দূরবীনের সাহায্যে স্পষ্ট করে দেখে, যে জিনিস খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীক্ষণের সাহায্যে তার বিশ্লেষণ করে। যেভাবে কলে সুতো তৈরি হয় তা দেখে আবু তালিব বিস্ময়ে বলেছিলেন যে একটি প্রকাণ্ড চাকা ঘোরালে সঙ্গে সঙ্গে শত শত ছোট চাকা ঘুরতে শুরু করে এবং একই সঙ্গে হাজার হাজার গজ সরু সুতো তৈরি হয়। ফলে ভারতবর্ষে যে পরিশ্রমে দশ গজ সুতো বোনা যায়, ইংলণ্ডে সেই একই পরিশ্রমে তার বহুগুণ সুতো মেলে বলে কাপড়ের দাম কমে, উৎপাদন বেড়ে যায়।

নৌ-শক্তির ব্যবহারে ইংলণ্ড যেভাবে ইয়োরোপে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল, তা-ও আবু তালিবের দৃষ্টি এড়ায়নি। রুশিয়া, প্রুশিয়া, ডেনমার্ক এবং সুইডেনের সমবেত শক্তিকে নৌ-শক্তির বলেই ইংরেজ অগ্রাহ্য করেছিল। ইয়োরোপেও বোধ হয় নৌ-শক্তির তাৎপর্য এত পরিষ্কারভাবে আবু তালিবের পূর্বে বেশি লোক বোঝেনি। ইংরেজ-ফরাসী যুদ্ধে ইংরেজের জয়ের প্রধান কারণ তিনি নৌ-শক্তির মধ্যেই দেখেছিলেন। জাহাজে করে ইংরেজ সৈন্যদল ইচ্ছামত শত্রুকে যেখানে খুশী আক্রমণ করতে পারে। যুদ্ধে জয় হলে সেখানে রয়ে যায়, পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলে জাহাজে করে প্রত্যাবর্তন করে, ফলে ইংরেজদের শক্তি হানি হয় না। ফরাসী সৈন্যবাহিনী বিপুল শক্তিশালী হলেও তাই ইংরেজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না—ইংরেজের জাহাজের ব্যূহ ভেদ করে ইংলণ্ড আক্রমণ করা নেপোলিয়নের মতন

প্রতিভাশালী এবং দুর্ধর্ষ সেনাপতির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। আজ হাওয়াই জাহাজের আবির্ভাবের পরে অবস্থা অবশ্য বদলে গিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও নৌ-শক্তির বলেই ইংরেজ জয়লাভ করেছিল, সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে?

ইংরেজের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশংসায় আবু তালিব লিখেছিলেন যে রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশের ক্ষমতা ও কার্যক্রম এত সুসমঞ্জস যে তার তুলনা অন্যত্র মেলে না। ফলে ইংলণ্ডে সাধারণ নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা অব্যাহত। স্বাধীনতার পূজারী বলে প্রত্যেক ইংরেজই নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংলণ্ডেও যে কখনো কখনো স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয়, তাও আবু তালিবের দৃষ্টি এড়ায়নি। পীট যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও রাজা পীটকে বরখাস্ত করে দিলেন দেখে আবু তালিব গণতান্ত্রিক অধিকার হানির প্রশ্ন তুলেছেন। আইনের চক্ষে সমান হয়েও ধনী বা অভিজাত যেভাবে সাধারণ নাগরিকের তুলনায় নানা সুবিধা ভোগ করে, সে কথারও উল্লেখ তিনি করেছেন। ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের ফলে গণতান্ত্রিক সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পার্লামেন্টের সঙ্গে টেক্কা দিতে চায়, এসব দেখে আবু তালিব মন্তব্য করেছেন, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের মধ্যে সমান অধিকার কাজের চেয়ে কথায় বেশি, তাঁর মতে ধনী ও দরিদ্রের জীবনমানের পার্থক্য বোধ হয় ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের চেয়েও সে যুগে অধিক প্রকট ছিল।

ইংলণ্ডে শিক্ষার প্রসার এবং ব্যবসায়ীদের ভদ্র ব্যবহার আবু তালিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইংরেজ চায় যে লেখাপড়ার মাধ্যমে সবাই উন্নতি করবে। জনসাধারণ একে অপরের সুখসুবিধার দিকে যেভাবে দৃষ্টি রাখে, তারও আবু তালিব প্রশংসা করেছেন। দোকানে খদ্দের যে আদর পায়, ভারতবর্ষে তা বিরল। বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডে দোকানদারদের নীতি হল যে খদ্দের যা করে, তাই ঠিক। তার একটি হাস্যকর দৃষ্টান্ত দেখে আবু তালিব যুগপৎ তারিফ ও রহস্য করেছেন। একজন খদ্দের দোকানে গিয়ে হরেক রকমের দামী কাপড়ের নমুনা প্রায় ঘণ্টাখানেক দেখে অবশেষে ত্রিশ টাকা গজের কাপড়ের এক টাকার কাপড় কিনতে চাইলেন। দোকানদার কোনো কথা না বলে কাপড়ের উপর একটি টাকা রেখে সেই পরিমাণ কাপড় কেটে সযত্নে খদ্দেরকে দিয়ে দিলেন। তারপরে বিনা বাক্যব্যয়ে দুজনে পরস্পরকে নমস্কার করলেন এবং খদ্দের গম্ভীরভাবে এক ইঞ্চি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সমাজজীবনে সংযত ও শালীন ব্যবহারের আর একটি ঘটনারও আবু তালিব উল্লেখ করেছেন। এক মহিলা তাঁকে একবার চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বেয়ারা চা দিতে গিয়ে খুব দামী একটি পেয়ালা ভেঙে ফেলে। মহিলাটি একটি কথাও না বলে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে আবু তালিবের সঙ্গে আলাপ জারী রাখলেন। দেখে আবু তালিব মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষে এ রকম ঘটনা ঘটলে তাঁর সামনেই চাকরের কি হেনস্থা হত তা সহজেই বোঝা যায়।

বিলিতি আইন এবং বিচার প্রথা সম্বন্ধে আবু তালিবের অনেক বলবার ছিল। সে দেশের বিচারকদের তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং বুদ্ধিমান বলে প্রশংসা করে সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন যে আইন এত জটিল ও ঘোরালো এবং বিভিন্ন আইনের মধ্যে আইনের মধ্যে সঙ্গতি সময় সময় এত সূক্ষ্ম যে বহুক্ষেত্রে আইনের নামেই অবিচার হয়। আইনের জটিলতার জন্য উকিল মোক্তারের সুবিধা এবং সে সুবিধার সুযোগ নিয়ে তাঁরা মক্কেলদের

কাছে থেকে যথাসাধ্য ফি আদায় করে নেন। উকিল মোক্তারের ফি সম্বন্ধে আবু তালিবের মতামত এখনো বিপ্লবী মনে হবে। তিনি বলেছেন যে এতকাল বিচারকেরাও মক্কেলদের কাছে ফি নিতেন এবং তখন বহুক্ষেত্রে বিচার চড়া দরে বিক্রি হত। বর্তমানে বিচারকের বেতন রাষ্ট্র দেয়। কাজেই বিচারক আর মক্কেলদের অনুগ্রহনির্ভর নন। উকিল মোক্তার কিন্তু মক্কেলদের অর্থেই জীবিকানির্বাহ করেন, তাই ন্যায়বিচারের চেয়ে মক্কেলের স্বার্থরক্ষার দিকেই তাঁদের বেশি ঝোঁক। শুধু তাই নয়। প্রতিবারের শুনানীতেই ফি মেলে বলে শুনানীর সংখ্যা বৃদ্ধির লোভ সামলানোও সহজ নয়। আবু তালিবের মতে এই দুইটি কারণে আদালতের কাজ বিনা প্রয়োজনে বেড়ে গিয়েছে। যে মামলার ফয়সালা হয়তো এক সপ্তাহে হওয়া উচিত, বারবার মুলতুবী করে তাকে বছর দুই চালিয়ে নেওয়াও বিরল নয়। আবু তালিবের মতে বিচারকের মতন উকিল মোক্তারের বেতনও যদি সরকার থেকে দেওয়া হয়, মক্কেলদের কাছ থেকে তাঁরা যদি কোনো ফি না পান, তবে মামলা মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রতার একটি প্রধান কারণ দূর হয়ে যাবে।

বিলেতে এবং ভারতবর্ষে আইন আদালত নিয়ে আবু তালিব আরো অনেক কথা বলেছেন, এবং বহুলাংশে সে সব কথা আজও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বিশেষ করে আদালতে সাক্ষী দিতে যে জনসাধারণের আপত্তি, তার কারণ বিশ্লেষণ করে যে সব কথা তিনি বলেছেন, ভুক্তভোগী মাত্রেই তার সত্যতা স্বীকার করবেন।

৪

আবু তালিবের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করে ইয়োরোপ এবং এশিয়ার বাসিন্দা নরনারী আজো আনন্দ পাবেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। কবি বা সাহিত্যিকের চেয়ে ঐতিহাসিক হিসাবেই কিন্তু আবু তালিবের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের রাজরাজড়াদের নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম ইতিহাস লেখেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলাতে শুরু করে। যে কোন বিশেষ দেশের ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসের অন্তর্গত, তাই বাইরের পৃথিবীকে বাদ দিয়ে দেশের ইতিহাস লেখা অসম্ভব, এই কথা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয় যে কেবল রাজারানীর কাহিনী বা যুদ্ধের বর্ণনা সত্যিকার ইতিহাস নয়—জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যে ইতিবৃত্ত রচনা হয়, তা একদেশদর্শী এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাই সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসের পশ্চাদপটেই কোনো বিশেষ দেশ বা যুগের বিশেষ রাজারানীর ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

লব্বুসসিয়ার গ্রন্থে আবু তালিব তাঁর এ নতুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে বহু ইতিহাসের বই তিনি পড়েছেন, কিন্তু কোথাও মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসের পরিচয় পান নি। তাই নিজের অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়েও তিনি এ গুরুদায়িত্ব বহনে অগ্রসর হলেন। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর ইতিহাস সংকলন করতে তিনি পারেন নি, কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের যে পূর্ণরূপ তাঁর মনে ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করে ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত করেন। সংক্ষিপ্ত সারটি রচনার জন্য সহস্রাধিক বই থেকে তিনি তথ্য এবং তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন এবং এশিয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের রচনা ছাড়াও ইয়োরোপীয় বহু ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। আরবী ফারসী ইতিহাসে যে সব তথ্য মেলে, তাঁর গ্রন্থে তা তো

রয়েছেই সঙ্গে সঙ্গে কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওর কাহিনী, কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার এবং পশ্চিম জগতের ভূগোল নৃতত্ত্বের বিবরণও সেখানে মিলবে। ভারতবর্ষে অথবা ইয়োরোপে এ ধরনের বই সে যুগে বেশি রচিত হয়নি।

লব্বুসসিয়ারের ব্যাপক বিবরণে আবু তালিবের পাণ্ডিত্য ও উদার চিন্তাধারার পরিচয় মেলে, কিন্তু তাঁর বন্ধু রিচার্ডসনের অনুরোধে তিনি অযোধ্যার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখেন, তাতে তাঁর ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষমতা আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তফজিহুল গাফিলিন আকারে ক্ষুদ্র, তার বিষয়ও কেবলমাত্র একটি ভারতীয় প্রদেশের ভাগ্য কিন্তু সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অযোধ্যার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এবং যেভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও শক্তির আলোচনা করেছেন সে যুগে ভারতবর্ষে বা ইয়োরোপে তার তুলনা মেলা কঠিন। দুর্ভাগ্যবশত আবু তালিবের মূল রচনা আজ অবলুপ্ত কিন্তু ডাক্তার হোয়ি তার যে চমৎকার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন এখনো তা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

ঐতিহাসিক হিসাবে আবু তালিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজদরবারের ষড়যন্ত্রের কাহিনীকে তিনি ইতিহাসের একমাত্র বিষয় মনে করেন নি। ব্যক্তির প্রভাবে যে দেশের ইতিহাস বদলায় সে কথা তিনি মানতেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন যুগধর্মে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই ব্যক্তির ভাগ্যকেও নির্ণয় করে। লক্ষ্ণৌ দরবারের বিলাসব্যসন ও আড়ম্বর তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি বিশ্লেষণের ফলে এই সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছিল যে জনসাধারণের শোষণের উপর যেখানে মুষ্টিমেয় লোকের ঐশ্বর্য এবং বিলাস প্রতিষ্ঠিত সেখানে সমাজদেহ রোগদুষ্ট হতে বাধ্য। এ রকম পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে জনতা অসন্তুষ্ট এবং বিক্ষুব্ধ ও শাসকশ্রেণী অসৎ এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। ধনীর অত্যাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠে, তখন কৃষক সমাজে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়, বিপ্লবের প্লাবনে সমাজ সংগঠন ধ্বংস হয়ে যায়।

স্বল্পায়তন গ্রন্থেও আবু তালিব সেকালের শাসকশ্রেণীর অবিমৃষ্যকারিতা ও অপব্যয়ের বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। নবাব নিজে বিলাসী এবং অবিবেচক। কবুতর, বানর, সাপ অথবা হরিণের পিছনে যে অর্থ খরচ করতেন, তাতে সহস্র সহস্র প্রজা স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারত। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, কাজেই এইসব অপব্যয়ে নবাবের যে উৎসাহ, তাঁর অনুচরেরা তাকেও ছাড়িয়ে যেতো। একজন ওমরাহ সম্বন্ধে আবু তালিব লিখেছেন যে কেবলমাত্র মানুষ—এবং বিশেষ করে নিজের আত্মীয়স্বজন বা বৃদ্ধ ভৃত্য ছাড়া আর সমস্ত জীবনের প্রতিই তাঁর দয়া ছিল সীমাহীন। বিবাহ উপলক্ষে বাজী পুড়িয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হত অথচ রাজকাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একান্ত অভাব। নবাবের হুকুমে বড় বড় ইমারত তৈরি হত, কিন্তু আবু তালিবের ভাষায় 'দু তিন দিন ব্যবহারের পরে সে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়—কেউ আর ভুলেও সেদিকে যায় না।' এ অপব্যয়ের ঝক্কি পোহায় দরিদ্র জনসাধারণ, আবু তালিব তাঁদের খোদার বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন।

যে সমাজে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় এ রকম বিলাসব্যসনে রত, সেখানে যে প্রতি স্তরেই বে-আইনী জুলুম চলবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? লক্ষ্ণৌ তখন অযোধ্যার রাজধানী, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী নগর, কিন্তু সেখানেও জনসাধারণ বিচার পেত না। দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালত নামে থাকলেও কোনো অন্যায়ের প্রতিকার তারা করত না। অত্যাচারিত লোক যতদিন পারে সহ্য করত, যখন অসহ্য হয়ে উঠত তখন

মরীয়া হয়ে অত্যাচারের শোধ দিতে চেষ্টা করত।

সমস্ত দেশেই এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে দয়াদাক্ষিণ্যকে ধর্মের অঙ্গ মনে করা হয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে সেকালে ধনীসমাজ যেভাবে অর্থ বিতরণ করত, আবু তালিব কিন্তু তার সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে এসব দান খয়রাত হয় লোক দেখানো, নয় ধনীর ভাববিলাস। দুক্ষেত্রেই এ ধরনের দানে সমাজের কল্যাণ হয় না, বরং সমাজের অলস ব্যক্তি তার ফলে আরো অলস হয়ে পড়ে। লক্ষ্ণৌতে পেশাদারী ভিক্ষুকদের দৌরাত্ম্যের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, এখন পর্যন্ত কোনো কোনো শহরে পর্বদিনে তার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ইংলণ্ডে ভিক্ষাবৃত্তিকে আইন করে বন্ধ করে যে ভাবে ব্যক্তিগত দানখয়রাতের বদলে সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে দুঃস্থ দরিদ্র অশক্তের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়, তার ভূয়সী প্রশংসা করে আমাদের দেশেও আবু তালিব সেই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন।

শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদিন স্বার্থসংঘাতে রাষ্ট্রজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। আবু তালিব দুঃখ করে লিখেছেন যে অযোধ্যার শাসকশ্রেণী এত নির্বোধ যে নিজেদের সত্যিকার কল্যাণ কোথায় তাও তারা বোঝে না। সমৃদ্ধ ও সন্তুষ্ট প্রজাসাধারণই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং তারা যে পরিমাণ রাজস্ব যোগাতে পারে, দরিদ্র প্রজা কখনোই তা পারে না, কিন্তু অযোধ্যার শাসকশ্রেণী শোষণ করতে এত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল যে জনসাধারণকে অর্থ সঞ্চয় করতে দিতেও তারা অনিচ্ছুক। তাদের দূরদৃষ্টির অভাবে দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলেছিল। পূর্বে যে সব গ্রাম থেকে বছরে দু হাজার টাকা খাজনা আদায় হত, অত্যাচারের ফলে সে সব গ্রাম আজ একশো টাকা খাজনাও দিতে পারে না, এরকম দৃষ্টান্ত বারবার আবু তালিব দিয়েছেন।

আমাদের দেশে নসীবের দোহাই দিয়ে আমরা বহু দুঃখকষ্ট মুখ বুজে সহ্য করি। এ ধরনের সহিষ্ণুতা আবু তালিব সহ্য করতে পারতেন না। তিনি খেদের সঙ্গে লিখেছেন যে অনেকেই বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী, কিন্তু তবু এগিয়ে এসে কেউ কিছু করতে চায় না। অনুযোগ করলে বলে আমি একা এত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি করতে পারি?

ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান, তার ফলেই দেশের এ দুর্গতি এ কথা আবু তালিব পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন। তবু যে অত্যাচারিত জনসাধারণ বিদ্রোহ করেনি তার কারণ আলোচনায় তিনি লিখেছেন যে অদৃষ্টবাদ ছাড়াও ধর্মের দোহাই এবং শ্রেণীস্বার্থের প্ররোচনায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এ অবস্থা যে বেশিদিন টিকতে পারে না, অযোধ্যারাজের শীঘ্রই অবসান হবে সে কথা তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন।

পতনোন্মুখ রাষ্ট্রকে বাঁচাবার পথও আবু তালিব বাতলে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সমাজ সংগঠনের আমূল পরিবর্তন ভিন্ন বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে মন্ত্রিদের সংখ্যা কমিয়ে তাদের আয়-ব্যয়ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করতে হবে যে আইনভঙ্গ যিনিই করুন না কেন, তাঁকে নির্বাসন দিতে হবে। সেনাপতি হোক, উজির হোক অথবা সাধারণ প্রজা হোক—সকলেই যদি একবার আইনের মর্যাদা স্বীকার করতে শেখে, তবে দেশের দুর্গতি দূর হবে।

আবু তালিবের মতে এ সমস্ত ব্যবস্থায় অবস্থার খানিকটা উন্নতি হবে, কিন্তু সমাজের সত্যিকার কল্যাণের জন্য আরো আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এককালে হয়তো শাসকশ্রেণী শাসন করত, তাই সেকালে তারা যে সব সুখ-সুবিধা পেত, তারও খানিকটা সার্থকতা ছিল। বর্তমান যুগে শাসকশ্রেণীর সে সব দায়িত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই বর্তমানে কর্মহীন ও

দায়িত্বহীন শাসকশ্রেণী সমাজের গলগ্রহ। তাদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ না করলে বর্তমান অবস্থার প্রতিকার নেই। এভাবে সমূলে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করলে ভবিষ্যতেও আর অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকবে না।

ধনী দরিদ্রের ব্যবধানে যে শুধু শাসন ব্যবস্থার হানি হয়, তা নয়। মার্কসের পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আবু তালিব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন এ রকম সামাজিক অসাম্যের ফলে সংস্কৃতিরও বিকৃতি ঘটে। যারা বিনাশ্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে ধনের মালিক, তাদের বিদ্যা অর্জন বা জ্ঞানান্বেষণে আগ্রহ নেই। যারা দরিদ্র, জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের এত পরিশ্রম করতে হয় যে তাদের আর কোনো কথা ভাববার সময় বা উদ্যম থাকে না। ফলে সমাজের সত্যকার কল্যাণ এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির কাজে অলস ধনী অথবা অতি পরিশ্রান্ত দরিদ্র কেউ-ই উপযুক্তভাবে মন দিতে পারে না। সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে পারলে সকল মানুষের কল্যাণ, একথা আবু তালিব বারবার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

একথা বললে অন্যায় হবে না যে মার্কস্ ইতিহাসের যে অর্থনৈতিক বিবরণ দিতে চেয়েছিলেন, মার্কসের পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আবু তালিবের রচনায় তার স্পষ্ট পূর্বাভাস মেলে। মার্কস্ হেগেলপন্থী দার্শনিক, বুদ্ধি দিয়ে যে সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তাকে অমোঘ ও সার্বিক মনে করেছেন। তাই মার্কসের বহু ভবিষ্যদ্বাণী সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন ও শিক্ষা ও গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আবু তালিব মার্কসের তুলনায় অনেক বেশি ভূয়োদর্শী, জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের কারবারে জড়বিজ্ঞানের অমোঘ ও লঙ্ঘনহীন আইন চলে না। তাই অর্থনৈতিক শক্তির সংগে সংগে মানুষের আবেগ বিশ্বাস ও ধর্মের স্থানও তিনি স্বীকার করেছেন। মানুষের ইতিহাসে নৌ-শক্তির তাৎপর্য লক্ষ্য করে এডমিরাল মাহান প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু মহানের প্রায় একশো বছর আগে আবু তালিব সে বিষয়ে যে সুসংগত আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর দূরদৃষ্টি দেখে বিস্মিত হতে হয়। আবু তালিবকে তাই মার্কস্ বা মাহানের পূর্বদ্রষ্টা বলা চলে, বলা চলে যে অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক ইতিহাস পাঠের যে পথনির্দেশ করেছিলেন, আজো বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিকেরা সেই ধারা অনুসরণ করে চলেছেন।

অম্লান বিজেতা
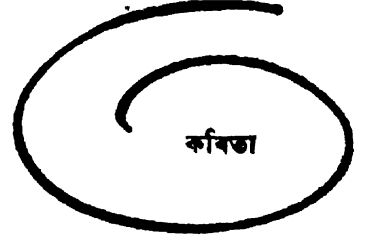
রাম বসু

নাচে পুঞ্জ পুঞ্জ আলো, বর্ণমালা ; নক্ষত্রের গান
সমুদ্রের শাঁকে। তরঙ্গিত দৃশ্যে অঙ্গে আঁকে রসকলি
কালের গম্বুজে কে দাঁড়িয়ে? তার শাণিত বয়ান
পুষ্পিত-বিদ্যুৎ নীলে। তৃণতরু স্থির দীপাবলী।

প্রার্থনার কিছু নেই। হীরক জননী হে অঙ্গার
আপনার পরিমাপ ছাড়িয়ে তাকাই, রাখি ছাপ
এ'টেল মাটির মুখে, কাঁটাবনে শিশির সম্ভার
আনন্দ-পীড়িত বোধ বৃন্তে ধরে সম্পূর্ণ গোলাপ।

সব বৈপরীত্য থেকে আমি মুক্ত, কস্তুরী, পিপাসা
চন্দন-চর্চিত গুল্ম, মেঘময় দিগন্তে বিভূতি
আদিম আগ্নেয় মন্ত্র, নষ্ট করি আশা ও নিরাশা
জীবন সাধনা শুধু শ্রমলব্ধ তরণী, প্রস্তুতি।

এস তবে শূন্যে ভাসি হে দহন কেন্দ্রের নর্তকী
ওষ্ঠপুটে কোটি শ্লোক, যন্ত্রণার নাম নচিকেতা
ধ্যানেই সমগ্র যদি ধ্যানতলে নাচ নাচ সখি
সর্বাঙ্গ তুলেছে বোল। তৃষ্ণা, তুমি অম্লান বিজেতা।

দ্বিতীয় পুরুষ

মৃগাঙ্ক রায়

তুমি আমাকে ধারণ করেছিলে
এখন প্রার্থী দ্বিতীয় পুরুষ।
দিন ফিরিয়ে অন্ধকার
মুখ ফিরিয়ে চুলের পিঠে রাত্রি
বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত শূন্যতার ক্ষয়;
কর্মে এবং নির্জনতার জ্বরে
বয়স বেড়েছে। তবু
সময়ের এক একটি বিন্দু অবাধ বিস্ফরিত॥

তুমি জানতে না, পরিতাপ ছিল
সে প্রেমের ভিতরে; লোহিত উদ্ভিদ ছিল
তোমার চোখের ভিতরে, আমি জানতাম না।
তোমার প্রীত ত্বক স্বেদ
উদ্গীরণ করেছিল॥

নক্ষত্র অজস্র হ'লে আকাশটা
বড় হ'য়ে জ্বলে, নগর রাজধানী মফস্বল
ধ'রে রাখে একই চক্রের পরিমাপে।
উত্তর শিয়রী নদী সাবলিল জলের মোচড়ে
ফেণায় ছড়িয়ে ধরে চমৎকার বর্ণচ্ছটা।
তোমার চোখের উদ্ভিদ বাড়ে আমার শরীরে॥

অথচ তোমার দুয়ারে প্রার্থী দ্বিতীয় পুরুষ।
তোমার মুখের কাছে আমার মুখ
শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মত হা ক'রে থাকে॥

শৈশবের দিকে

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

সেদিন সন্ধ্যায় আমি শৈশবের দিকে যাত্রা করেছিলাম।

আকাশে মেঘ, বাতাসে আসন্ন বর্ষার মাতন, দূরে বিদ্যুৎ
সমস্ত কলকাতা যেন এক পলকে গ্রাম হয়ে গেল,
কোন দূর প্রান্তে বৃষ্টি হল কে জানে, তারই গন্ধ মাতাল হাওয়া
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল
আমার শৈশবে।

রিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার গড়ের মাঠ পার হল,
দূরে রেড রোডের আলোগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে ভিজছে
মেঘের গুরু গুরু শব্দে আলোয় আলো চৌরঙ্গী
যাদুঘরের জানালায় মুখ রেখে
এক বুক শস্যের স্বপ্ন দেখছিল।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, পিচের রাস্তা বৃষ্টির জলে মুখ ধুয়ে প্রস্তুত।
বান এসেছে, বান এসেছে, দাও কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দাও
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কদম গাছে হঠাৎ বুঝি ফুল ফুটল
আর তারই গন্ধে বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার
হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল হাজার হাজার বাতিকে।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, কনডাক্টার গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও
আমি নামব, এখানেই নামব।

গাড়ি থামল না।

এই সব ভেবে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

ইতিহাসে স্বর্ণযুগ দাবি ক'রে
'সম্রাট হব' এ বাসনা
কখনো রাখিনি মনে,
বরং করেছি উপাসনা :
আমাকে নির্বোধ কর, নির্বোধ আমি যাব মরে।
বুদ্ধিমান হয়ে শেষে একদিন ক্ষমাহীন পাপে
নিষ্ঠুর ধ্বংসের দায়ে অনুশোচনায় প্রতি ক্ষণে
ভাবি, কোন দ্বিপ্রহরে অতর্কিত বক্ষমর্মরে
জেগে উঠব না এতটুকু ভালবাসার উত্তাপে।

এখন বিকাল হবে : ক'টি ছোট শিশু কিছু দূরে
গাছে ঘাসে চারিপাশে ইচ্ছায় তারা একাকার।
এ্যাস্‌প্লানেডের আলো শহরের প্রতিবিম্ব ধরে
কত লোকে কত ইচ্ছা করে—
আমারও কি কোন ইচ্ছা এমনি অপার ?
সন্ধ্যাসমাগমে জ্বলে এ্যাস্‌প্লানেডের নীল আলো।
আমাকে নির্বোধ কর এই নীল আলো থেকে ছুঁড়ে :

এই সব ভেবে চিন্তা এবং ভাবনা ফুরাল॥

হাওয়া প'ড়ে গেছে

সিদ্ধেশ্বর সেন

হাওয়া প'ড়ে গেছে, হাওয়া
এক একটা রাত্রিও, যায়
ভাদ্রের নিথর

এক একটা রাত্রি বরাহ
-মিহিরের সে গণনা
কিম্বা খনা
তারও বচনের চেয়ে, যা', স্বল্প-
বাক্, নিরুত্তর

হাওয়া প'ড়ে গেলে, পড়ে
পশ্চিমে ও পূবে
থীব্স-এ
অরক্ষিত রাজধানী, সৌধ-প্রাকার, বুঝিবা
কলকাতায়

বিষমপ্রদাহে, পুড়ে
দগ্ধ-জব্দ হাওয়া
প'ড়ে যায়
ঊরুভঙ্গে দ্বৈপায়ন

দ্বীপের উপর, ঘোর
ক্ষিতি-অপ্-তেজ
-স্ক্রিয়তায়, ভস্মাধার
ভস্ম-
পাত হাওয়া

পৃথিবীর অটুট, অটুট হেন সমুন্নত গম্বুজ-নগর

উন্নতশীর্ষগুলি, কা'রা, একে একে
টলে, নাকি
ঘুরে যায়, পড়ে

কল্পে-কল্পশেষে, ভূগোলোক-ইতিবৃত্ত ক্ষয়-
সংক্রমিত, সংক্রামক ঝটিকায়

শুধু একঘরে—
টাইরেসিয়স্‌, বয়সসময়হীন
দৃষ্টিবন্ধ, অন্ধ, লোলচর্ম এক. বৃদ্ধ, উভলিঙ্গ যেন,
ভাবে
পড়ন্ত-দেয়ালে পিঠ, নড়েচড়ে বসে. ভাবে
ত্রিকালদর্শী বটে. হাওয়া॥

একটি সেতুর জন্মকথা

ইভো আঁন্দ্রিচ

প্রধান উজীর হওয়ার পর, চতুর্থ বৎসরে ইউসুফের পা ফসকালো। ব্যাপারটা একেবারেই আকস্মিক। অপ্রত্যাশিতভাবেই সুলতানের কুনজরে পড়তে হল্। ভাগ্য-বিপর্যয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল সারা শীত ও বসন্তকাল ধরে। কিন্তু এমন হাড়-জ্বালানো বসন্ত, যে বলবার নয়। তার ঠাণ্ডা শয়তানির চোটে গ্রীষ্ম সুরু হবার অবকাশই পেল না। অবশেষে মে মাসে ইউসুফ বেরিয়ে এলেন তাঁর নির্বাসন থেকে। ভাগ্যের খেলায় তাঁর জয় হয়েছে পুরানো সম্মান আবার ফিরে এলো।

তারপর জীবন আগের মতই চলল। শান্ত স্বচ্ছন্দ এবং প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সারা শীতভোর সেই দীর্ঘ মাসগুলি,—যখন জীবন আর মৃত্যু, গৌরব আর অপমানের মধ্যে নিক্তির কাঁটার মত দুলছিল তাঁর অদৃষ্ট,—তারা কি যেন সব ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল। সেই থেকে বিজয়ী উজীরের মনের মধ্যে লেগে রইল কেমন যেন বিষাদ আর অস্বস্তির চিহ্ন। একটা অন্যমনস্ক ভাব, অস্পৃশ্য অপ্রকাশ্য। শুধু যারা ভুক্তভোগী, জীবনে ঘা খেয়েছে, তারাই এমন উচাটন ধরনটা ধরতে পারে। কোনও মতে প্রকাশ করে না, এক অসতর্ক মুহূর্তে ছাড়া। এই ফাঁকা অস্বস্তি গোপন সঞ্চয়ের মতই তারা পুষে রাখে, বাইরের নজর থেকে আড়াল করে রাখে—পাছে হাবভাবে ধরা পড়ে যায়—

আত্মনির্বাসনের সময় উজীরের নিঃসংগ মনে অনেক ভাবনাই উদয় হত। নৈরাশ্যবোধ, শূন্যতার বেদনা কিংবা অপমানের আঘাত মানুষের মনকে ছোটায় অতীতের দিকে। চোখ পড়ে পিছনপানে। উজীরের মনেও তাঁর দেশের গাঁয়ের কথা আর বাল্যকালের স্মৃতি আবার যেন স্পষ্টাকারে ফুটে ওঠে। মনে পড়ে যায় বাপ-মায়ের কথা।

ইউসুফ যখন সুলতানের অশ্বরক্ষীর অধীনে সামান্য একটা বেতনভোগী কর্মচারী, তখন তাঁরা উভয়েই গত হলেন। তারপর অবশ্য দুজনের কবরই পাথরের গাঁথুনি দিয়ে বাঁধিয়ে ওপরে সমাধি-স্তম্ভ খাড়া করিয়ে দিয়েছেন ইউসুফ। মনে পড়ে যায়—বসনিয়ায় সেই ছোট্ট গ্রামখানি, জেপা। গ্রাম ছেড়ে তিনি চলে আসেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ন'বছর।

বর্তমানে এই অশান্তির দিনে ভারি ভালো লাগে সেই দূরের দেশ আর ছড়ানো-মেলানো গ্রামখানির কথা ভাবতে। গ্রামের প্রতিটি ঘরে তাঁর নিজের কীর্তিকাহিনী গল্পকথার সামিল। কনস্টান্টিনোপলে বসে ইউসুফ যে কৃতিত্ব আর সাফল্য দেখিয়েছেন, গ্রামের সকল লোকই সে কথা বলাবলি করে। কিন্তু কেউ কি জানে, গৌরবের উল্টোপিঠে কি আছে, আর সিদ্ধির জন্যে কি দাম দিতে হয়!

এই তো এবার গ্রীষ্মকালে বসনিয়া-ফেরৎ লোকদের সংগে তাঁর কথাবার্তা বলার সুযোগ হল। ইউসুফ তাদের অনেক প্রশ্ন করলেন, অনেক দরকারী খবর জেনে নিলেন। যুদ্ধ আর বিপ্লবের পর অনেক কিছু ঘটেছে,—দাংগা অনটন অনশন আর হরেক রকমের মারীভয়। ইউসুফ হুকুমজারী করলেন, জেপায় এখনও যে সব তাঁর গাঁয়ের লোক আছে, তাদের সাহায্যের জন্য মোটা টাকা বরাদ্দ করা হোক। সেই সংগে আরও নির্দেশ দিলেন, ঘর-বাড়ি তোলবার জন্য গ্রামবাসীদের কি কি প্রয়োজন তা আনতে হবে। ইউসুফ খবর

পেলেন, গ্রামের সবচেয়ে অবস্থাপন্ন ঘর শেতকিচরা। তাদের এখনও খান চারেক বাড়ি আছে বটে। কিন্তু গ্রামের অন্যত্র আর আশপাশের অঞ্চল—এদের দৈন্যদশার সীমা নেই। মসজিদটা ধ্বংসই পড়েছিল, আগুন লেগে তাও শেষ হয়েছে। একটিমাত্র পানীয় ঝরনা, সেটা গেছে শুকিয়ে।

আর সব থেকে বড় অসুবিধা, জেপা নদীর ওপর কোন পুল নেই। গ্রামখানি ছোট এক পাহাড়ের ওপর, ঠিক যেখানে জেপা এসে মিশেছে ড্রিনা নদীতে। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ উজানে জেপা পেরিয়ে ওধারে ভিশেগ্রাদে পৌঁছুতে হয়। তক্তা দিয়ে যে রকম পুল বানাও না কেন, জলের তোড়ে ভেসে যাবে। টেঁকে না, কারণ হয় জেপার জল আশ্চর্যভাবে তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, যেমন পাহাড়ী নদীতে হামেশা হয়ে থাকে। নয়ত ড্রিনা বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে জেপার খাতে ঢুকে পড়ে ওর প্রবাহকে আটকে দেয়। তখন জেপার জল উপচে পড়ে, কাঠের পুল ঠেলে ওঠে। তারপর খরস্রোতে কোথায় ভেসে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেন কস্মিনকালে পুল ছিল না ওখানে। আবার শীতেও সমূহ বিপদ। বরফ পড়ে পড়ে তক্তাগুলো এমন পিছল হয়ে থাকে যে, মানুষ কি জন্তু কেউই তার ওপর পা রাখতে পারে না। পড়ে গিয়ে প্রায়ই চোট খায়। অতএব, কেউ যদি স্থায়ীগোছের শক্ত একটা পুল তৈরি করিয়ে দেয়, তাহলে দুর্ভাবনা ঘোচে। গাঁয়ের লোকদের মস্ত উপকার হয়।

উজীর তো আগে মসজিদের মেঝেয় পাতবার জন্য খান ছ'য়েক গালচে আর তিন-নলওয়ালা একটা ঝরনা বানাবার জন্য উপযুক্ত খরচের টাকা পাঠিয়ে দিলেন জেপায়। তারপর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, সেতু একটা তৈরি করাতেই হবে।

কনস্টান্টিনোপ্‌লে এই সময়ে বাস করছিলেন এক ইটালিয়ান ওস্তাদ শিল্পী। শহরের কাছাকাছি গোটাকয়েক পুল তৈরি করে খুব নাম-ডাক হয়েছে তাঁর। উজীরের খাজাঞ্চী তাঁকে নিযুক্ত করে রাজসভার দুজন লোককে সংগে দিয়ে বস্‌নিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

ভিশেগ্রাদে যখন তারা হাজির হলেন, তখনও বরফ গলতে সুরু করেনি। ভিশেগ্রাদের লোকেরা কয়েকদিন ধরে ওস্তাদদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে রইল। কোলকুঁজো মানুষ, পাক-ধরা চুল। কিন্তু তাজা যৌবন তার মুখে, রঙটিও লালচে আভায় যেন ফেটে পড়ছে। ওস্তাদ ভিশেগ্রাদ পাথরের সেতুটাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেন, ঘোরেন এদিক-সেদিক। কখনও পাথর ঠুকে দেখেন, কখনও বা সুরকী-মশলা খসিয়ে জিভে ফেলে চেখে নেন। তারপর চলে গেলেন বানিয়াতে, যেখান থেকে ভিশেগ্রাদের পুল বানাবার জন্য পাথর আমদানী করা হয়েছিল। সেখানে পাথর কাটার খাদ মাটিতে বুজে রয়েছে, কাঁটা-ঝোপ আর আগাছায় ভর্তি। ওস্তাদ জন-মজুর লাগিয়ে দিলেন, খাদ পরিষ্কার করতে হবে।

মাটি খুঁড়ে সাফ করতে লাগল তারা। তারপর, একদিন খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল বেশ চওড়া আর গভীর এক পাথরের স্তর। ভিশেগ্রাদের সেতুতে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল, তার চেয়ে এ পাথর আরও মজবুত, আরও ধব্‌ধবে শাদা। তখন ওস্তাদ ড্রিনা নদীর গতি ধরে নেমে এলেন নীচের দিকে, জেপার মুখ পর্যন্ত। মনে মনে আঁচ করে নিলেন কাটা-পাথর কোন্ জায়গা দিয়ে পার করিয়ে এধারে এনে ফেলা যায়। তারপর একদিন উজীরের লোক ফিরে গেল কনস্টান্টিনোপলে। সংগে নিয়ে চলল প্ল্যান আর হিসাবের ছক।

ওস্তাদ রয়ে গেলেন, অপেক্ষায় রইলেন তার ফিরে আসা পর্যন্ত। কিন্তু ভিশেগ্রাদে কিংবা জেপা নদীর ধারে কোন খ্রীস্টানবাড়িতে উঠলেন না। ড্রিনা আর জেপার মাঝখানে একটা তে-কোণা উঁচু জমি ছিল। সেইখানে এক কাঠের কেবিন তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। উজীরের দেওয়া লোক আর ভিশেগ্রাদের এক কেরানী তাঁর দোভাষীর কাজ করতে লাগল। চাষীদের কাছ থেকে শুকনো ফল, ক্রীম, ডিম, পেঁয়াজ এইসব কিনে নিজেই রান্না করে খেতেন। কিন্তু লোকে বলত, মাংস তিনি নিতেন না। সারা দিনটাই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। হরেক রকমের কাজ, কখনও ড্রয়িং করছেন, নানা ধরনের পাথর পরখ করে দেখছেন, আবার কখনও বা জেপা নদীর স্রোত এবং গতি নিয়ে মাপ-জোক করছেন। ইতিমধ্যে কনস্টান্টিনোপল থেকে সরকারী লোকটি ফিরে এল, উজীরের সম্মতি আর খরচের টাকার কিছু অংশ নিয়ে।

কাজ শুরু হয়ে গেল। এমন নতুন দৃশ্য দেখে মানুষের বিস্ময় আর কমে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কারণ, যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে সেতুর কোনও মিল নেই।

প্রথমে কতকগুলি পাইনের বীম টেনে দেওয়া হল জেপার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি-ভাবে, তবে একটু বাঁকা করে। তারপর বীমগুলোর মাঝখানে দুসার গুঁড়ি ফেলে সব একসঙ্গে ভাল করে 'ব্রাশ্‌উড' দিয়ে বাঁধা হল। তারপর চড়ানো হল কাদার প্রলেপ, ভাল করে জোড় লাগাবার জন্যে। এখন সমস্ত জিনিসটা লম্বা ট্রেঞ্চের মত দেখতে হল। এই ভাবে নদীর গতি ঘুরিয়ে দেওয়া হল অন্য দিকে, নদী তলদেশের প্রায় অর্ধেকটা জল নিকাশ করে শুকনো করা হল। কিন্তু কাজটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে পাহাড়ে কোথায় যেন অতিবৃষ্টির ফলে নদীতে ঢলঢল নামলো। জেপা তো অল্পক্ষণের মধ্যেই ফুলে ফেঁপে অস্থির। সেই রাত্রেই নতুন বাঁধের মাঝখানটা ধ্বসে গেল জলের তোড়ে। পরের দিন ভোর-বেলায় জল সরে গেলে দেখা গেল, বীমগুলো স্থানচ্যুত, গুঁড়িগুলো বাঁকাচোরা অবস্থায় ভেঙে রয়েছে আর খড়-কাদার গাঁথনি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন।

গাঁয়ের লোক আর মজুরদের মধ্যে অবশ্য কথা চালাচালি হত, জেপা বড় নারাজ মেয়ে, বুকের ওপর দিয়ে পুল বাঁধতে সে কিছুতেই দেবে না। কিন্তু পরের দিনই ওস্তাদ করলেন কি, ঢালা হুকুম দিলেন নতুন কাঠের গুঁড়ি আবার পুঁতে দাও এবার আরও গভীর করে। আর বাঁকাচোরা বীমগুলো মেরামত করে সোজা লাগিয়ে দাও যেমন ছিল আগে। চলল কাজ। হাতুড়ির একটানা ঠকাঠক শব্দ, দুরমুসের আওয়াজ আর শ্রমিকদের চেঁচা-মিচিতে নদীর উপলশয্যা আবার মুখর হয়ে উঠল। তারপর সব যখন ঠিকঠাক তৈরি এবং বানিয়া থেকে পাথরের চালান এসে হাজির, তখন ভালমেশিয়া আর হার্জেগোভিনা থেকে রাজমিস্ত্রী আর অন্যান্য কারিগর এসে পেঁছুল। তাদের জন্যে কাঠ দিয়ে কুটীর বানানো হয়েছিল ইতোমধ্যে। সেই কুটীরগুলির সামনে তারা পাথর কাটতে ও ঘসতে লাগল। পাথরের গুঁড়োয় চেহারাও সব সাদা, আটার কলের মানুষদের মত। ওস্তাদ সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন, কখনও হলুদ রঙের তেকোণো লোহার যন্ত্র, নয়তো সবুজ গোছের একটা রুল নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে মাপজোক করতে লেগেছেন। নদীর দুই তীরে খাড়া পাহাড়, সেখানেও কাটিং সুরু হয়ে গেছে। এমন সময় টাকা গেল ফুরিয়ে। শ্রমিকদের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব ঘনিয়ে উঠল আর সেই সুযোগে স্থানীয় লোকেরা কানাঘুষা আরম্ভ করল, কিছুই হবে না এ পুল দিয়ে। ও আর শেষ হয়েছে! ওদিকে রাজধানী থেকে কারা যেন এসে রিপোর্ট দিল যে কনস্টান্টিনোপলে জোর গুজব, উজীরকে সরানো হয়েছে। তাঁর জায়গায়

এখন অন্য লোক বসেছে। কেউই অবশ্য সঠিক বলতে পারল না, উজীরের ব্যাপারটা কি—অসুখ, না কি দুশ্চিন্তা। তবে তিনি নাকি আর বেরোন না, লোকে তাঁর নাগাল পায় না। রাজধানীতে যে সব কাজকর্ম শুরু হয়েছিল, মানে দরকারী রাজকীয় কাজ, সেগুলো না কি বন্ধ হয়ে গেছে। উজীরের কোন হুঁশ নেই। তবু কয়েকদিন পরেই উজীরের লোক ফিরে এলো বাকী টাকা নিয়ে। কাজ আবার চালু হল।

সেন্ট ডিমিট্রিয়সের পর্বের দিন আসতে তখনও এক পক্ষকাল বাকী; যেখানে কাজ হচ্ছে তারই কিছু ওপর দিকে কাঠের পুল দিয়ে জেপানদী পার হবার সময়ে লোকেরা প্রথম দেখল, পাথর কেটে সাদা মসৃণ দেয়াল উঠেছে। নদীর দুই তীরে ছাই রঙের শ্লেট্ পাহাড় থেকে এই প্রাচীর যেন দুই বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। তার গায়ে মিস্ত্রীদের জন্যে ভারা বাঁধা রয়েছে, যেন অজস্র মাকড়সার জাল। তারপর থেকে সেতু-বন্ধের কাজ ক্রমশ এগিয়ে চলল। কিন্তু প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ বন্ধ রাখতে হল। রাজমিস্ত্রীর দল শীতকালে যে যার ঘরমুখো। কেবল ওস্তাদ রয়ে গেলেন তাঁর সেই কাঠের কুটীরে। ঘরের বাইরে বড় একটা বেরুতেন না। সারাদিন নকশা আর হিসেবের কাগজ নিয়েই তাঁর সময় কাটত। মাঝে মাঝে এক-আধবার বেরিয়ে এসে কাজের জায়গায় একটু ঘুরে যেতেন। তারপর বসন্তকাল শুরু হবার মুখে যখন বরফ একটু একটু গলতে আরম্ভ করল, তখন দেখা যেত চিন্তিত মুখে তিনি বাঁধের কাজ তদারক করছেন ঘন-ঘন। কখনো বা রাত্রিতে টর্চ নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন, আলো ফেলে দেখতেন।

সেন্ট জর্জ উৎসবের আগেই শ্রমিকরা ফিরে এলে, আবার কাজ সুরু হল। এবং গ্রীষ্মের ঠিক মাঝামাঝি পুলটি তৈরি হয়ে গেল। মজুরের দল খুশি মনে ভারা খুলতে লাগল। তখন আড়কাঠ আর তক্তার কাঠামো থেকে মুক্ত হল আসল রূপ। দুধারে গ্রানাইট পাথরের খাড়া তীর, মাঝখানে ধনুকের মতন শুভ্র কৃশকায় সেতু। এই নির্জন রিক্ত অঞ্চলে এমন একটি আশ্চর্য-সুন্দর গঠিত বস্তুর আবির্ভাব যেন কল্পনাই করা যায় না। দেখলে মনে হয়, যেন দুই কূল দুধার থেকে প্রচণ্ড জলস্রোত ছুঁড়ে দিয়েছে ওপর দিকে। মাঝপথে জমাট হয়ে তাদের মিলন শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে। নীচে গভীর খাদ আর তারি ওপর ঐ অর্ধ-বৃত্ত। যেন ক্ষণিকের শূন্যকে ধরে ফেলেছে। খিলানের মধ্যে দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় শেষ বিন্দুতে সুনীল ড্রিনার ক্ষীণায়ত একটি অংশ। আর সেতুর নীচে কলস্বনা জেপা বয়ে চলেছে। বন্ধন স্বীকার করে এমন পোষ মেনেছে। দেখে আর আশ মেটে না, চোখও যেন বিশ্বাস করতে চায় না ছিমছাম ঐ খিলানের অপরূপ ছাঁদ। মনে হয়, এই নিরানন্দ শিলামরুতে রুক্ষ অঞ্চলে ও জিনিস বেমানান। বুঝি ক্ষণিকের বিশ্রাম! প্রথম সুযোগেই উড়ে পালাবে, শুরু হবে স্তব্ধ পরিক্রমা।

আশপাশের গ্রামের লোকেরা সেতু দেখতে এল, আর এল ভিশেগ্রাদে এবং রোগ্যাতিসে থেকে শহুরে মানুষ। সকলের মুখেই প্রশংসা। কিন্তু আফশোস এই যে, তাদের শহর-বাজার অঞ্চলে না হয়ে, এ পুল তৈরি হল এমন জনবিরল পাথুরে জায়গায়। জেপার বাসিন্দারা গর্বে উৎফুল্ল। পুলের গায়ে হাত চাপড়ে বলে, প্রধান উজীর থাকা ভাগ্যের কথা, আর নানান ভাবে দেখে তাদের সেতুর চমৎকার গড়ন। যেমন সোজা, তেমনি চোখা—যেন পাথরে গড়া নয়, টীজে কেটে তৈরি। বিস্মিত মুগ্ধ পথিকেরা সেতু দিয়ে পারাপার করে। এদিকে ওস্তাদ মজুরদের পাওনা মিটিয়ে, কাগজ-পত্র যন্ত্রপাতি প্যাক করে মাল বোঝাই দিয়ে কনস্টান্টিনোপল মুখে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল উজীরের লোক দুটি।

আজ-কাল শহরে-গ্রামে লোকমুখে ওস্তাদেরই কথা। সেলিম নামে এক বেদে আসর মাত করে। সরাইখানায় বসে কতবার যে ঐ আগন্তুকের কাহিনী শোনায় তার ঠিক নেই। ভিশেগ্রাদ থেকে ওস্তাদের মালপত্তর তারই ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গল্পের আর কামাই নেই। 'সত্যি, ওস্তাদ ছিলেন আলাদা জাতের মানুষ, তুলনাই হয় না কারুর সঙ্গে। শীতের সময় কাজ যখন বন্ধ, আমি তাঁর ক্যাবিনে ঢুকিনি প্রায় দিন পনেরো। তারপর যেদিন প্রথম গেলুম, দেখি—সব আগোছালো। জিনিসপত্তর ছড়ানো, যেমনটি দেখে গিছলুম ঠিক তেমনি পড়ে আছে। হাড় জমানো কনকনে ঐ ঘরে একলা বসে আছেন ওস্তাদ: মাথায় এক ভাল্লুকের চামড়ার টুপি আর গায়ে জাব্বা-জোব্বা। কেবল হাত দুটি দেখা যাচ্ছে—ঠাণ্ডায় একেবারে নীল। পাথরের কুঁদোয় মাঝে মাঝে ঘা দিচ্ছেন, দু-এক টুকরো খসে পড়ছে আর তিনি কি সব লিখছেন। বসে বসে ঐ এক কাজ! দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই আমার দিকে একবার সবজে চোখ তুলে তাকালেন। ঘন ভুরুর নীচে সে চোখা চাউনি যেন মানুষ গিলে খায়। কিন্তু একটি কথা নয়, ফিসফিস আওয়াজও বেরোয় না মুখ থেকে। এমন মানুষ কখনো দেখিনি। বললে বিশ্বাস করবে না—আঠারো মাস মুখ বুজে একটা লোক এমনি কাজ করে গেল; আশ্চর্য! কাজ শেষ হলে খেয়ায় পার করে সঙ্গে দিলুম এই ঘোড়াটা, আর উনি তাই চেপে চলে গেলেন। ফিরেও তাকালেন না!'

শ্রোতাদের কৌতূহল বাড়ে। ওস্তাদের জীবন নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে, আর যত শোনে ততই অবাক হয়। আফশোস করে—ওস্তাদ যতদিন ছিলেন কখনো সখনো পথে বেরোতেন, তখন তাঁর দিকে তেমন নজর দেয়নি।

ইতোমধ্যে, ওস্তাদ বাড়ি যেতে যেতে প্লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কনস্টান্টিনোপল শহর তখন আর দু'রাতের পথ। শহরে পৌঁছুলেন প্রবল জ্বর নিয়ে। ঘোড়ার পিঠে কোনো রকমে বসে এসেছেন, কিন্তু এসেই সোজা হাসপাতালে। তার পরের দিন ঠিক ঐ সময়ে, ইটালির ফ্রান্সিসক্যান মিশনের হাসপাতালে এক সন্ন্যাসী সেবকের হাতে মাথা রেখে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ল।

পরের দিন সকালেই ওস্তাদের মৃত্যু-সংবাদ আর তাঁর হিসাব-নিকাশ কাগজ-পত্র উজীরকে পৌঁছে দেওয়া হল। ওস্তাদ তাঁর পারিশ্রমিকের মাত্র সিকি ভাগ পেয়েছিলেন। নগদ কি দেনা, উইল কিংবা ওয়ারিশ কিছুই রেখে যাননি। ভালো ভাবে বিবেচনা করে উজীর হুকুম দিলেন যে, ওস্তাদের প্রাপ্য অর্থের একের তিন অংশ হাসপাতালে দেওয়া হোক আর বাকি দু'ভাগ দিয়ে অনাথদের জন্য একটি অন্নসত্র খোলা হোক।

শেষ গ্রীষ্মের এক শান্ত সকাল। উজীর ওস্তাদের শেষকৃত্য সম্পর্কে যখন তার নির্দেশ দিচ্ছেন, এমন সময়ে এক আবেদন-পত্র এসে পৌঁছুল তাঁর হাতে। আবেদন-পত্র লিখেছে বর্সানিয়ারই এক অধিবাসী—কোরাণে পণ্ডিত তরুণ এক শিক্ষক। যুবক তার পরিচিত, মার্জিত কবিতা লেখে বলে উজীরের নেকনজর ছিল তার ওপর। মধ্যে মধ্যে সাহায্যও করেছেন। উজীরের আনুকূল্যে বর্সানিয়ায় যে সেতু নির্মাণ হয়েছে, সে খবর শুনে যুবক লিখেছে যে জনসাধারণের কল্যাণে অনুষ্ঠিত সব কাজেরই একটা পরিচিতি থাকা দরকার। কে এ কাজ করল, কার দাক্ষিণ্যে এ কাজ সম্পন্ন হল, তার একটা স্থায়ী পরিচয়লিপির প্রয়োজন আছে। অতএব উজীরের কাছে তার বিনীত অনুরোধ, যেন সেতুটির ওপর তার জন্মকথা খোদাই করার জন্য তারই রচিত স্মারক কবিতাটি গ্রাহ্য হয়। সঙ্গে পাঠিয়েছে আলাদা এক মোটা কাগজে লেখা চমৎকার একটি কবিতা। নীচে লাল আর

সোনালী কালিতে তারই স্বাক্ষর। কবিতার মর্মার্থ :

সুনিশ্চিত রূপদক্ষতা
আর অপরূপ শাসনপ্রতিভা
যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে
এই আশ্চর্য সুন্দর সেতু।
উজীর ইউসুফের জয়গান করে
তাঁর অনুগত দল,
আর দুনিয়ার মানুষ
প্রশস্তি জানাবে চিরকাল।

নীচে আঁকা উজীরের শীলমোহর,—ডিম্বাকৃতি, দুই অসমান ভাগে বিভক্ত। বড়টিতে লেখা : ইউসুফ ইব্রাহিম, আল্লার দাসানুদাস। অপেক্ষাকৃত ছোট ভাগটিতে তাঁর নিজস্ব নীতিবাক্য: নীরবতায় নিরপত্তা।

অনেকক্ষণ ধরে উজীর খুঁটিয়ে দেখলেন আবেদন-পত্রটি। দু'হাত দু'দিকে,—এক হাতে চেপে আছেন সেতুটির নকশা এবং হিসাব-পত্রের কাগজগুলো আর এক হাত ঐ কবিতায় লেখা পরিচয়-লিপির ওপর। ইদানীং তাঁর অনেক সময় চলে যায় সরকারী দলিল আর নানা রকম দরখাস্ত বিবেচনায়।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দু'বছর হল এই গ্রীষ্মে। পূর্ব-প্রতিপত্তি ফিরে পেয়েছেন অবশ্য। কিন্তু প্রথমে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি নিজের মধ্যে। এখন তাঁর সেই বয়স, যেটা সবচেয়ে ভালো—যখন মানুষ জীবনের পুরো দাম জানে এবং বোঝে। শত্রুপক্ষ পরাস্ত হয়েছে, এখন তাঁর প্রভাব আগের চেয়ে ঢের বেশী। অতএব সাম্প্রতিক পতনের গভীরতা দিয়েই বর্তমান উন্নতির উচ্চতাটুকু যাচাই করা যায়। তবু মনের দুশ্চিন্তাগুলো দূর করে দিলেও স্বপ্নকে প্রতিরোধ করা যায় না। ইদানীং রাত্রে প্রায়ই জেলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। জেগে উঠলে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা মিলিয়ে যায় বটে, কিন্তু একটা অজানা আতঙ্কের রেশ থেকে যায়। সারাটা দিন বিষময় হয়ে ওঠে অসহায় তিক্ততায়।

উজীর ক্রমশই স্পর্শকাতর হয়ে পড়লেন, চারপাশের আবেষ্টনী সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা অতিরিক্ত বেড়ে উঠল। যে সব জিনিস আগে নজরে পড়ত না, সেইগুলো এখন চরম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। হুকুম দিলেন প্রাসাদ থেকে যাবতীয় মখমল সরিয়ে তার বদলে রাখতে হবে ঝলমলে সুতীর কাপড়। নরম অথচ স্পর্শ করলে একটু খসখসে আওয়াজ হয়। ঝিনুকের তৈরি যে কোনও জিনিসের ওপর তাঁর বিজাতীয় ক্রোধ জন্মাল। কেন না, শুক্তি আনে নির্জনতার সংকেত। ঠাণ্ডা মসৃণ কিছু দেখলে মনের মধ্যে নিজেরই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ ভাব জেগে ওঠে। ছুঁলে তো আর কথাই নেই, দাঁতে দাঁত লেগে যায়। গায়ের চামড়া পর্যন্ত কুঁচকে আসে! প্রাসাদের যত আসবাব আর অস্ত্র-শস্ত্র, যাতে মখমল আর ঝিনুকের স্পর্শ আছে—সব দূর করে দেওয়া হল।

এই দুঃখ, এই রিক্ততাবোধ ভিতরে পাক খেতে লাগল। এমন লোক নেই যাকে বিশ্বাস করে বলা যায়, মন খোলসা করা চলে যার সামনে। ভিতরের কাজ সেরে, অন্তঃসার খেয়ে ফেলে সেই গোপন কণ্ট যখন শেষে ফুটে বেরোয়, তখনও রহস্য চেপে রাখতে হয়। প্রকাশ করা চলে না ঘুণাক্ষরেও। লোকে শুধু ফলটা দেখে আর বলে : মৃত্যু। মৃত্যুই তো। আকস্মিক হলে অপঘাত। নইলে কত যে লোক—কত ক্ষমতাশালী বড়লোক ধীরে ধীরে

নীরবে এবং অদৃশ্যভাবে নিজেদের ভিতরেই মরে যাচ্ছে এই রকম করে। তিল-তিল মৃত্যু, কিন্তু অনিবার্যগতি এবং অবধারিত।

উজীরের এখন প্রত্যেক জিনিসেই চাপা কিন্তু গভীর সন্দেহ আর অবিশ্বাস। কি জানি কেন, তাঁর পাপশঙ্কী মনে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, মানুষের প্রতিটি কাজ, প্রত্যেক কথা ঐ অমঙ্গলের দিকে চলেছে। যা কিছু শুনেছেন দেখেছেন, বলছেন বা ভাবছেন, তার মধ্যেই দুর্ভোগের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। ক্ষমতা ফিরে পেয়েও বিজয়ী উজীর পরাস্ত হলেন নিজের কাছেই। আসলে, তিনি জীবনকে ভয় করতে সুরু করেছেন। এবং অজ্ঞাতসারেই এমন এক মানসিক পর্যায়ে এসে পেঁৗছেচেন যাকে বলা চলে মৃত্যুর প্রথম অবস্থা। যখন কায়ার চেয়ে প্রক্ষিপ্ত ছায়ার দিকে আকর্ষণটা বড় হয়ে ওঠে, তখনই আরম্ভ হয় অপমৃত্যু।

রাতে অনিদ্রার ফলে সেদিন সকালে আবার ক্লান্তবোধ করছিলেন উজীর। তবে বাইরের চেহারা স্থির ও শান্ত। কেবল চোখের পাতা দুটি ভারী আর মুখখানা কেমন থমথমে। সকালের তাজা হাওয়াতেও সে ভাবটা যায়নি। বসে বসে ভাবছিলেন ঐ বিদেশী ওস্তাদের কথা, যাঁর মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু যাঁর পরিত্যক্ত উপার্জনে অনাথরা খেয়ে বাঁচবে। ভাবছিলেন সেই দূর বসনিয়ার কথা,—রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চল, যার সম্বন্ধে কেবলই এক নিরানন্দ ছবি ভেসে ওঠে মনের মধ্যে। ইস্‌লামের আলোকেও তার তিমিরাবরণ মুক্ত হয়নি একেবারে। সেখানকার জীবনে মার্জিত নাগরিকত্ব নেই, আছে জমাট দুঃখ। শুধু নির্বোধ নির্দয় পশুধর্ম, আর আল্লার দুনিয়ায় এ রকম অন্ধকার দেশ আর কটা আছে, কে জানে! আরও কত দুর্দম পার্বত্য নদী যার না আছে সাঁকো, না আছে পারানীর ব্যবস্থা। তাঁর সৃষ্ট জগতে এমন কত জায়গা আছে যেখানে পানীয় জলই নেই, আছে কত মসজিদ যার অলঙ্কার নেই, সংস্কারও হয় না। এই রকম দুর্দশা, দৈন্য আর ভয় নানান্ আকারে পৃথিবীকে পূর্ণ করে রেখেছে, আর সেই সব চরম দুঃখের চিন্তাতেই উজীরের মন ভরে উঠেছিল।

সুন্দর ছোট্ট গ্রীষ্মবাস। ছাদের টালিগুলো সূর্যের কিরণ লেগে আরও ঝকমক করছে। উজীর সাহেব আবার পড়লেন শিক্ষকের রচনা ঐ কবিতাটি। ধীরে ধীরে হাত তুলে কেটে দিলেন, দুবার। আর একটু অংশ বাকী রইল। কিছুকাল পরে সেটুকুও কমে গেল। কেননা, শীল-মোহরের যে ভাগে তাঁর নাম ছিল, সেখানে ঢ্যারা লাইন টেনে দিলেন ভালো করে। পরিকল্পিত নক্সায় অবশিষ্ট রইল শুধু : নীরবতায় নিরপত্তা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন কাগজখানি। তারপর আস্তে আস্তে হাত নেমে এল। এবারে সে বাক্যটিও ঢাকা পড়ল কাটার দাগে। সেই ভাবেই সেতুটি রয়ে গেল নামহীন পরিচয়হীন।

সেই সেতুই রয়েছে বসনিয়ায়। সূর্যালোকে দীপ্ত হয়ে ওঠে, আবার চাঁদনি রাতে বিচ্ছুরিত হয় তার শুভ্রতা। তারই বুকের ওপর দিয়ে হাঁটে মানুষ আর পালিত পশু, চলে নিত্য পারাবার। নতুন গড়া ইমারতের আশ-পাশে ছড়ানো স্বাভাবিক আবর্জনাগুলো একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসে। ভাঙ্গাচোরা জমির বৃত্তকার অংশটুকুও পূর্ণ হয়ে এল। মাটিতে পোঁতা খোঁটা আর ভারা বাঁধার তক্তা কাঠ এবং পড়ে থাকা মালমসলাগুলো টেনে নিয়ে গেল মানুষে না হয় জলের স্রোতে। কাজ শেষের অবশিষ্ট চিহ্ন ধুয়ে-মুছে নিল বর্ষার জল! তবুও দেশ প্রসন্ন মনে সেতুকে গ্রহণ করতে পারল না, পুলটাও দেশকে আপন বলে ভাবতে শিখল না। রইল তার বিচ্ছিন্ন দূরত্ব নিয়ে। পাশ থেকে দেখলে মনে হয়, শাদা

খিলানটা যেন শূন্যকে জুড়ে আছে—নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র নির্ভীক। পথিকদের চমকে দেয় সে দৃশ্য—যেন কোনও এক আশ্চর্য ভাবনা পথ হারিয়ে বন্দী হয়েছে বিজন দেশের পাথুরে পাহাড়ে।

এ গল্পের যিনি কথক, তিনিই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন এই সেতুর আদি কাহিনী খুঁজে বার করতে। ফিরছিলেন একদিন পাহাড়ী পথ বেয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, দেহ অবসন্ন। বসে পড়লেন পুলের প্রাচীরের কোলে। সময়টা গ্রীষ্ম, দিনে গুমোট কিন্তু রাতে শিরশিরে ঠান্ডা ভাব। পাথরের গায়ে হেলান দিতেই পিঠে একটা উত্তাপ অনুভব করলেন। দিনের গরম ছাপ তখনও মুছে যায়নি। পরিশ্রমে ঘাম ঝরছিল, এমন সময় ড্রিনার জলের ওপর দিয়ে এক শীতল হাওয়ার ঝলক এসে গায়ে লাগল। এক অদ্ভুত অনুভূতির আবেশ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। সযত্নে কাটা পাথরের আলসে থেকে ধীরে ধীরে একটা সুখকর কোমল তাপ পিঠ বেয়ে যেন উঠে আসছে বুকের কাছে।

সেই মুহূর্তে জন্ম নিল বিচিত্র এক সমবেদনা, গড়ে উঠল বহু-ঈপ্সিত মনের মিল—মানুষ আর সেতুর মধ্যে। এবং সেইখানে বসে তখনই মন স্থির করে ফেললেন, ঐ পাথরের পুলের জন্মকথা তাঁকেই লিখতে হবে।

ওমর খৈয়াম-এর কুজা-নামা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কুমোর পাড়া দিয়ে যাবার সময় দেখি অজস্র মাটির পাত্র—কুঁজো, হাঁড়ি, কলসি, সরা—থরে থরে সাজানো রয়েছে। তারা কি কথা কয়? তারা কি স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের জীবনের নশ্বরতাকে? জানিনে এই কর্মব্যস্ততার দিনে কজন এই মৃৎপাত্রদের দিকে তাকিয়ে দেখেন; কিন্তু যদি দেখেন তাহলে তাঁরাও বোধ করি আটশ' বছর আগেকার এক দার্শনিকের মত তাদের ভাষা শুনতে পাবেন—এই মৌন মৃৎপাত্রের বাণী তাঁদের অন্তরে পেঁাছোবে।

ঘিয়াসুদ্দিন আবুল ফথ্ ওমর বিন্ ইব্রাহিম অল্ খৈয়াম্ ছিলেন জ্ঞানী ব্যক্তি। দ্বাদশ শতাব্দীতে শুধু পারস্যে কেন সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর মত গণিতজ্ঞ এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তি কমই ছিলেন কিন্তু এই ব্যক্তিটি কিছু সংখ্যক চৌপদী ভিন্ন আর কোনও পরিচয় রেখে যাননি যাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি: বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পরিবেশে তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় তাঁর পাঁচ শতাধিক রুবাই ছন্দে রচিত চৌপদীতে। ওমর খৈয়ামকে আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণত জানেন এমন এক কবি হিসাবে যিনি সুরা এবং উপভোগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। ওমর খৈয়াম যদিও জীবন সম্বন্ধে বলিষ্ঠ আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি মানবজীবনের নানা সীমাবদ্ধ দিক সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন কোথায় মানুষ দুর্বল অসহায়, কোথায় সে অশক্ত—কোথায় তার সবকিছু দৈবের হাতে বাঁধা। এই নিরুপায়তার কথা বহুবার বহুভাবে তিনি বলে গেছেন। তাঁর যেসব কবিতা কুজা-নামা বলে বিদিত তাতেও মানবজীবনের নশ্বরতার কথাই প্রচারিত হয়েছে কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গী বড়ই মধুর, করুণ এবং রহস্যময়। মাটির কুঁজো দেখে তাঁর মাটির মানুষের কথাই মনে পড়েছে। বাদশা থেকে দীনাতিদীন—সবাই মাটিতে মিশে এক হয়ে যাবে—মৃৎপাত্রগুলি থেকে এই ঘোষণাই তিনি বারবার শুনতে পেয়েছেন। কুজা-নামা আসলে কোনো বিশেষ কাব্য নয়। তাঁর যে কয়টি কবিতায় কুজা অর্থাৎ আমাদের মাটির কুঁজোর নাম উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিকে একত্র করে বলা হয় কুজা-নামা।

ওমর খৈয়াম স্বীকার করে নিয়েছেন যে আমরা যা আমরা তাই—তার চেয়ে ভাল হওয়া আর সম্ভব নয়। কেন—তার উত্তরে তিনি বলছেন—

তা খাক্ মরা কালেব্ আমিখ্‌তা আন্দ্
ব্যস্ ফেৎনা কে আজ্ খাক্ বর্ আঙিগখ্‌তা আন্দ্
মন্ বেহেতর্ আজ্ ইন্ ন মী তুয়ানম্ বুদন্
কজ্ বুতে মরা চুনীন্ বেরুণ্ রিখ্‌তা আন্দ॥

যেহেতু আমার দেহ মাটির মিশ্রণে তৈরি
আর, সেই মাটি যা দিয়ে আমি গড়া
তাতে অসারত্বই বেশি

সেহেতু এর চেয়ে ভাল হবার ক্ষমতা আমার নেই
কারণ আমার এই দেহ এইভাবেই গঠিত হয়ে
আত্মপ্রকাশ করেছে।

আর একটি চৌপদীতে তিনি বলছেন—

আজ্ আব্ ও গেলম্ সিরিশ্তায়ে মন্ চ্-কুনম্
ওইন্ পশম্ ও কস্ব্ তু রিশ্তায়ে মন্ চ্-কুনম্
হর্ নেক্ ও বদী কে আয়েদ্ আজ্ মা ব্-ওয়াজুদ্
তু বর্ সার্ মন্ নুশ্তায়ে মন্ চ্-কুনম্

আমার শরীরের জল মাটি কে মিশিয়েছে—সে কি আমি?
এই পশম ও মসৃণ বস্ত্র কে বুনেছে---সে কি আমি?
আমার অস্তিত্ব থেকে যা কিছু ভাল মন্দ প্রকাশ পাচ্ছে
সে আমার কপালে কে লিখে দিয়েছে—সে কি আমি?

ওমর খৈয়াম নিশাপুরে নিভৃতে বাস করতেন। তাঁর বাল্যবন্ধু নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ ছিলেন সুলতান মালিক শার উজীর। তাঁর কাছ থেকে খৈয়াম কিছু বৃত্তি আর একটু জায়গা চেয়েছিলেন যাতে তিনি বিনা বাধায় বিজ্ঞান চর্চা করতে পারেন। তাঁর প্রার্থনা পূরণ করা হয়েছিল। তিনি আপনার মনে নিজের কাজ করে যেতেন আর হয়ত একাকী নিশাপুরের রাস্তায় পরিভ্রমণ করতেন। কুমোরদের পাড়া দিয়ে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন আর মৃৎপাত্রদের দেখে তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হত তা লিপিবদ্ধ করতেন। এই-রকম কয়েকটি রুবাই উদ্ধৃত করলে তাঁর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বর্ কুজাগরে বজির্ করদম্ গুজারি
আজ খাক্ হমী নমুদ্ হরদম্ হুনারি
মন্ দীদম্ আগর্ ন-দীদ্ বে-খবরে
খাক্ পেদারম্ বর্ ক্যফ্ হর্ কুজাগরী।

যেতে যেতে রাস্তার নিচে এক কুম্ভকারকে দেখলাম
সবরকম মৃৎশিল্পই সে প্রদর্শন করছিল
আমি দেখলাম—আর যার সে দৃষ্টি নেই সে দেখল না
যে-সব কুম্ভকারের হাতে আমার পিতৃদেহের মৃত্তিকা।

দর্ কারগাহ্ কুজাগরী করদম্ রায়ে
দর্ পায়ে চর্‌খ দীদম্ উস্তাদ্ ব্‌পায়ে
মীকর্‌দ্ দিলীর্ কুজারা দস্তা ও সর্
আজ কল্লায়ে পাদ্‌শাহ্ ও আজ পায়ে গদায়ে

রাস্তায় কুমোরের কারখানা পড়েছিল
সেখানে ওস্তাদ কারিকরকে চাকা ঘুরোতে দেখলাম
সে কুঁজোর হাতল আর মাথা শক্ত করে তৈরি করছিল-

বাদশার মাথা থেকে আর ভীখারীর পা থেকে।

দর্ কার্‌গাহ্ কুজাগরী রফ্‌তম্ দোশ্
দীদম্ দু হাজার কুজা গুইয়া ও খামোশ্
নগাহ্ একে কুজা বর্ আওর্‌দ্ খুরোশ্
কো কুজাগর্ ও কুজাখর্ ও কুজাফারোশ্

কাল রাত্রে এক কুম্ভকারশালায় গিয়েছিলাম
দেখলাম দু হাজার কুঁজো—কেউ কথা বলছে কেউ স্তব্ধ
হঠাৎ একটা কুঁজো চিৎকার করে বলে উঠল—
কোথায় কুঁজো-নির্মাতা, কোথায় কুঁজোর-ক্রেতা
আর কোথায় কুঁজো-বিক্রেতা।

এই কবিতাটি শব্দসম্ভারে এবং আবেগে, আকুলতায় অসামান্য। মৃৎপাত্র যেন আমাদেরই মত জীবনরহস্যের কোন সন্ধান খুঁজে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইছে—কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, কার কাজে আমরা লাগব আর কেই-বা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করছে।

আটশো বছর আগে কুমোরেরা যেমন করে পায়ে মাটি চটকাতো আজও তাই করে। কুমোরশালার কাছ দিয়ে যারা চলা ফেরা করেন তাঁরা দেখতে পাবেন কেমন করে দাঁড়িয়ে তারা নানা মশলা সহযোগে মাটিকে পদদলিত করে। ওমর খৈয়ামও এই দৃশ্য দেখতেন। কিন্তু মাটি তাঁর কাছে জীবন্ত; এই শরীরই তো মাটি আর মাটিই এই শরীর। মাটির ওপর এই আঘাত যেন তাঁর বুকে বাজত। একটি রুবাই-য়ে তিনি বলছেন—

দী কুজাগরী ব্‌দীদম্ অন্দর্ বাজার্
বর্ তাজা গেলে লাকদ্ হমী জদ্ বেশীয়ার্
ও আন্ গেল্ ব্‌জবান্ হাল বা উয়ো মীগুফ্‌ৎ
মন্ হম্‌চু তূ বুদাহ্ আম্ মরা নেকুদার্।

কাল বাজারে এক কুম্ভকারকে দেখলাম
তাজা মাটিকে ভীষণভাবে পদদলিত করছে
সেই মাটি তাকে উত্তেজিতভাবে বলছিল—
আমি তোরই মত ছিলাম আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর্।

আর একটি রুবাই—

আয়ে কুজাগরা ব্‌কুশ্ আগর্ হুশিয়ারী
তা চান্দ্ কুনী বর্ গেল্ আদম্ খোয়ারী
আংগুস্ত্ ফরীদুন্ ও ক্যাফ্ কাইখস্রুত
বর্ চর্‌খ্ নেহাদায়ে চেহ্ মী পেন্দারী।

হে কুম্ভকার, যত্নবান হও, একটু সাবধানতা অবলম্বন কোরো—
যাতে মাটির মানুষের ধ্বংস কম হয়

হিসেব করে দেখ তুমি তোমার চাকায়
ফরীদ্নের আঙ্ল আর কাইখস্রুর হাত সঁপে দিচ্ছ।
(ফরীদ্ন—পারস্যের রাজা: খৃষ্টজন্মের প্রায় সাতশ' পঞ্চাশ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন। কাইখস্রু—সম্রাট সাইরাশ নামে পরিচিত।)

পানপাত্রকে দেখে খৈয়াম তার মনুষ্যরূপ কল্পনা করেছেন। তার অনুভূতিকে তিনিও যেন অনুভব করেছেন।

ইন্ কুজা চু মন্ আশিক্ জারী বুদস্ত্
দর্ বন্দ্ সর্ জুল্ফ্ নিগারী বুদস্ত্
ইন্ দস্তা কে দর্ গরদন্ উয়ো মী বিনী
দস্তিস্ত্ কে বর্ গরদন্ ইয়ারে বুদস্ত্

এই কুঁজো আমারই মন প্রেমিকের দুঃখ জেনেছে
এর ভিতরে প্রতিফলিত হয়েছে বেণীবন্ধের চিত্র
এর গ্রীবায় এই যে হাতল দেখছ
সে হাতের মত প্রিয়ার কণ্ঠসংলগ্ন হয়েছিল।

পানপাত্রের ভঙ্গুরত্বে তিনি মানবজীবনের নশ্বরতার কথা স্মরণ করেছেন।

জামিস্ত্ কে আকল্ আফ্রীন্ মাই জন্দিশ্
সদ্ বুসা জ্ হুস্ন্ বর্ জবীন্ মাই জন্দিশ্
ইন্ কুজাগর্ দহর্ চুনীন্ জাম্ লতীফ্
মীসাজদ্ ও বাজ্ বর্ জমীন্ মাই জন্দিশ্।

এই যে পাত্র এতে জ্ঞান এবং মহিমা বর্তমান
সুরার প্রতি রইল আমার প্রণতি।
এই সৌন্দর্যের জন্য এর ললাটে শতচুম্বন
সুরার প্রতি রইল আমার প্রণতি।
এত সুন্দর এই পাত্রকে চিরন্তন মৃৎশিল্পী (কুঁজো-নির্মাতা)
এমনভাবে গড়ে তোলেন আর আবার ছুঁড়ে ফেলেন মাটিতে
সুরার প্রতি রইল আমার প্রণতি।

মদ্যপায়ীর হাত থেকে নিক্ষিপ্ত পান পাত্র তাঁর সামনে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। তিনি তাতে আঘাত পেয়েছেন। এত সুন্দর সুগঠিত জিনিস এমনি অবহেলায় চূর্ণ হয়ে যাবে! কিন্তু আমাদের জীবনেও তো তাই হয়। আমাদের এত প্রিয় এই দেহও-তো একদিন এমনি নির্মমভাবে ভেঙে পড়ে। যে এই দেহকে গড়ছে সেই ভাঙছে --এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য।

তর্কীব্ পেয়ালায়ে কে দর্ মাই পাইয়ুস্ত্
ব্-শিকাস্তন্ আন্ রুয়া ন-মী দারদ্ মস্ত্
চান্দীন্ সার্ ও পায়ে নাজ্নীন্ আজ সার্ দস্ত্
আজ মিহির্ কে পাইয়ুস্ত ও ব্-কীন কে শিকাস্ত্

সুরার মধ্য দিয়ে যোজনা করা হয়েছে যে পেয়ালার অঙ্গ
সুরাপায়ী তার ভাঙনকে সমর্থন করতে পারে না
নখাগ্র থেকে আপাদমস্তক—এই সমস্ত সৌন্দর্য
স্নেহ দিয়ে যে গড়ে তুলল সেই তাকে ভেঙে দিলে ঘৃণাভরে।

আর একটি কবিতায় বলছেন—

বর্ সঙ্গ্ জদম্ দোশ্ সবুয়ে কাশে
সর্ মস্ত্ বুদম্ কে করদম্ ইন্ ওবাশে
বা মন্ ব-জবান্ হাল্ মী গুফ্ৎ সবু
মন্ চুন্ তু বুদম্ তু নীজ্ চুন্ মন্ বাশী

হায়, কাল রাত্রে পাত্রটাকে পাষাণের ওপর আছড়ে মেরেছিলাম
ঘোর মত্ততায় করেছিলাম এই উচ্ছৃঙ্খলতা
পাত্রটা আমাকে উত্তেজিতভাবে বলেছিল—
আমি তোর মত ছিলাম তুইও আমার মত হবি।

মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা মনে করে তিনি কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন তার পরে তো মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে যাবে। তিনি বলছেন—

তা চান্দ্ আসীর্ আকল্ হর্ রুজে শুয়েম্
দর্ দহর্ চেহ্ সদ্ সালে চেহ্ একরুজে শুয়েম্
দর্ দাহ্ তু ব্-কাসে মাই আজ্ আন্ পেশ্ কে মা
দর্ কায়গা কুজাগরান্ কুজা শুয়েম

প্রতিদিন সামান্য জ্ঞানের বন্দীত্ব স্বীকার নাই করলাম
শাশ্বত কালে একশ' বছর রইলাম বা একদিনই থাকলাম
কুম্ভকারের কর্মশালায় মাটির কুঁজোয় পরিণত হবার আগে
দাও তুমি আমাকে সুরার পাত্র।

জান্ পেশ্তর্ আয়ে সনম্ কে দর্ রহ্গুজরে
খাক্ মন্ ও তু কুজা কুনদ্ কুজাগরে
জান্ কুজায়ে মাই কে নিস্ত্ দর্ওয়ায়ে জারারে
পর্ কুন্ কদাহী ব্-খুর্ ব্-মন দেহ্ দীগরে।

প্রিয়, এই পথ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার বেশ কিছু আগে
আমার এবং তোমার মৃত্তিকা থেকে
বিনা আয়াসে কুম্ভকার কুঁজো নির্মাণে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে
এক পাত্র পূর্ণ করে পান কর এবং অপর একপাত্র আমাকে দাও।

মাটির মানুষকে তিনি সুরাপাত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন—

আদম্ চু সোরাহী বুয়াদ্ ও রুহ্ চু মাই
কালেব্ চু নাই বুয়াদ্ সদায়ে দর্ ওয়াই

দানী চেহ্ বুয়াদ্ আদম্ খাকী খৈয়াম
ফানুস্ খিয়ালী ও চেরাঘে দর্ওয়াই।

মানুষ যেন একটা সোরাহী (কুঁজো) আর সুরা তার আত্মা
শরীর যেন বাঁশি আর তাতে রয়েছে তার ধ্বনি
খৈয়াম, তুমি কি জানো মাটির মানুষ কী
সে খেলার ফানুস—তার ভিতরে জ্বলছে একটি প্রদীপ।

সুরাপাত্রের সুরা—তারই বা অবস্থিতি কতক্ষণ? সেও তো শেষ হয়ে যায় এক চুমুকেই—

লব্ বর্ লব্ কুজা বর্দম্ আজ্ ঘায়েৎ আজ্
তা তল্বম্ ওয়াসিতায়ে ওমর্ দরাজ্
বা মন্ ব্-জবানে হাল্ মীগুফ্ৎ সবু
ওমরে চু তু বুদা আম্ দমে বা মন্ সাজ।

আকুল কামনায় পানপাত্রের ওষ্ঠের সঙ্গে ওষ্ঠ স্থাপন করি
তার কাছ থেকে যেন জীবনের মেয়াদ বাড়াতে চাই
পানপাত্র আমাকে ব্যাকুলভাবে বলে—
আমার আয়ুও তোমারই মত
　　আমার সঙ্গে এক নিশ্বাসে শেষ হবার জন্য প্রস্তুত হও।

মৃত্যুকে তিনি বন্ধুর মত বরণ করবার উপদেশ দিয়েছেন। মরণ যেন তাঁর কাছে সুরার মতই মধুর—তিনি তা পরম সমাদরে পান করতে প্রস্তুত।

দর্ দায়রায়ে সিপিহ্র্ না-পয়দা ঘাউর্
জামিস্ত্ কে জুম্লারা চশানীদ্ ব্দাউর
নউবৎ চু ব্দাউর্ তু রশিদ্ আহ্ মকুন্
মাই নুশ্ ব্-খুশ্দিলী কে দোস্ত্ ব্খুর।

নভোমণ্ডলের গভীরে সবাইকার চোখের আড়ালে একটা পাত্র আছে
সবাইকে তা আস্বাদ করানো হবে পর্যায়ক্রমে
তোমার পালা যখন আসবে আর ঘুরে ঘুরে সে পাত্র
　　তোমার কাছে পেঁছোবে
তখন "আঃ" কোরো না; পান কোরো প্রফুল্ল চিত্তে যেন
　　সে তোমার বন্ধু।*

* বলা বাহুল্য ফার্সী চৌপদীগুলি যথাযথ উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একথা বলাই বেশি যে—যেভাবে লেখা হয়েছে পড়া সেভাবে হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এটা সহজেই বুঝতে পারবেন। তথাপি মূল সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত ধারণা করা যাবে এই কারণেই মূল চৌপদী উদ্ধৃত হল। তাছাড়া যাঁরা ফার্সী জানেন তাঁদের কাছে মূলের মাধুর্য বিশেষভাবে উপভোগ্য হবে। অনুবাদ কবিতায় না করে গদ্যে করেছি যাতে ভাষান্তর মূলানুগ হতে পারে।

—লেখক

চৈতালী রাতের স্বপ্ন

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্‌স্‌ নগরী। রাজপ্রাসাদ।

থিসিয়াস, হিপোলিটা, ফিলোষ্ট্রাটে এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ

থিসিয়াস। সুন্দরী হিপোলিটা, আমাদের বিবাহের মুহূর্ত আসন্ন।
আর মাত্র চারদিন পরে দেখা দেবে নূতন চাঁদ।
তবু মনে হয় এই কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র যেন
বড় ধীরে নিচ্ছে বিদায়; কামনা ফুরিয়ে গেছে,
তবু বারাংগণা বা বিগতযৌবনা ললনার মতন
আঁকড়ে রয়েছে আমায়, যুবক প্রেমিকের টাকা শুষে নিয়ে
তবে দেবে ছুটি।

হিপো। দেখতে দেখতে চারটে দিন
বিলীন হবে রাতের আঁধারে। স্বপ্ন দেখে কেটে যাবে
চার রাত্রির ব্যবধান। তারপর দেখা দেবে
রূপোর বাঁকা ধনুর মতন ছোট্ট নূতন চাঁদ,
আসবে সেই উৎসব-রজনী।

থিসিয়াস। যাও ফিলোষ্ট্রাটে।
হৈ হুল্লোড়ে মাতিয়ে তোলো নগরীর যত যুবকদের,
জাগিয়ে তোলো লঘুছন্দ আনন্দের স্বপনচারীদের,
চিতায় তুলে পুড়িয়ে দাও দুঃখব্যথা যত।
ম্লানমুখের দরকার নেই, মানবে না এই উৎসবে।

[ফিলোষ্ট্রাটে-র প্রস্থান]

হিপোলিটা, প্রেম নিবেদন করেছি তোমায় তরবারির জোরে,
আঘাত হেনে জয় করেছি তোমার ভালবাসা।
কিন্তু এবার অন্য সুরে বাঁধবো তোমায় জীবনডোরে,
উৎসব আর উল্লাসে।

[ইজিয়াস, হার্মিয়া, লাইস্যাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস্‌-এর প্রবেশ]

ইজিয়াস। এথেন্‌স্‌—অধিপতি থিসিয়াসের কুশল হোক।

থিসিয়াস। ধন্যবাদ সজ্জন ইজিয়াস, কি সংবাদ তোমার?

ইজিয়াস। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আমি, নালিশ আছে
আমার কন্যা হার্মিয়ার বিরুদ্ধে।
ডিমিট্রিয়াস, এগিয়ে এস। প্রভু, এই যুবকের সংগে

আমার কন্যার বিবাহ হোক এ-ই আমার ইচ্ছা।
এগিয়ে এস লাইস্যাণ্ডার; হে রাজন,
এই ব্যক্তি ইন্দ্রজালে জয় করেছে আমার কন্যার অন্তর।
তুই, তুই লাইস্যাণ্ডার—আমার মেয়েকে কবিতা লিখে পাঠাস,
প্রেমের উপহার আদান-প্রদান করেছিস কতবার।
চাঁদনি রাতে হার্মিয়ার জানলায় গেয়েছিস কত গান,
গলাটাকে ন্যাকা-ন্যাকা করে প্রেমের কথায় প্রেমের সুর
গেয়েছিস বহুবার! স্বপ্ন-দেখা মুগ্ধ মেয়ের মন করেছিস হরণ--
দিয়েছিস তাকে নিজের মাথার কয়েকগাছা চুল, আংটি,
শস্তা গয়না, টুকিটাকি, শখের জিনিস, ফুলের তোড়া,
হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি--কোমলপ্রাণা বাচ্চা মেয়ের চোখে
এই সবই হোলো বৃন্দাদূতীর মতন।
চাতুরী তোর গ্রাস করেছে হৃদয় আমার মেয়ের,
তাই বাপের কথা শোনে না আর, হয়েছে একগুঁয়ে।
মহান অধিপতি, সাফ কথা বলুক আমার মেয়ে
ডিমিট্রিয়াস-কে করবে কিনা বিয়ে। নইলে
এথেন্স্-এর সেই পুরোণো আইনে করুন এর বিচার--
মেয়ে আমার সম্পত্তি, যেমন ইচ্ছা তেমন বিলোবো,
এই ছেলেকে দান করবো, কার বাপের কি?
নইলে দিন মৃত্যুদণ্ড হার্মিয়াকে, আইনে তাই আছে বিধান।

থিসিয়াস। হার্মিয়া কি বলো? ভেবে দেখ সুন্দরী,
পিতা হোলো সাক্ষাৎ ভগবান। তোমার ঐ রূপ
সৃষ্টি করেছেন পিতা; পিতার হাতে তুমি মোমের পুতুল,
নিজেই গড়েছেন, নিজেই পারেন দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে দিতে।
আপত্তি কেন? ডিমিট্রিয়াস যোগ্য পাত্র।

হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডার--ও।

থিসিয়াস। মানছি সেটা। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে,
লাইস্যাণ্ডার হয়েছে তোমার পিতার বিরাগভাজন,
তাই ডিমিট্রিয়াসের যোগ্যতা ঢের বেশি।

হার্মিয়া। পিতা কেন দেখতে চান না আমার চোখ দিয়ে?

থিসিয়াস। তুমিই বা কেন দেখতে পাও না পিতার বুদ্ধি নিয়ে?

হার্মিয়া। মিনতি করছি মহান অধিপতি ক্ষমা করুন আমায়।
জানি না কি আশ্চর্য পুলকে হয়েছি লজ্জাহীন,
জানি না কোথায় গেল নারীর বিনয়,
কোন সাহসে এই সভায় নিভৃত চিন্তা আমার করছি প্রকাশ।
তবু বলুন কি হবে চরম শাস্তি আমার
যদি ডিমিট্রিয়াস-কে করি প্রত্যাখ্যান।

থিসিয়াস। হয় মৃত্যুদণ্ড, আর নয়তো চিরকুমারীর ব্রত।

তাই, রূপসী হার্মিয়া, ভাল করে ভেবে দেখ কি তুমি চাও।
তোমার যৌবন, তোমার উত্তপ্ত রক্ত, কামনা-বাসনা রাশি
সইতে কি পারবে তারা সন্ন্যাসিনীর চিবর?
মঠের অন্ধ কারায় রুদ্ধ তাপসী নারীর জীবন
পারবে মাথায় নিতে? রাত কাটাবে বন্ধ্যা চাঁদের পানে
অস্ফুট মন্ত্র করে উচ্চারণ? যারা পেরেছে সব চাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে
চিরকুমারীর তীর্থযাত্রায় জীবনটাকে বাঁধতে
স্বর্গসুখ হয়তো তাদের পুরস্কার।
কিন্তু হাসিকান্নার এই জগতে কাঁটার বৃন্তে ঝরে যাওয়া
কুমারী ফুলের চেয়ে ঢের বেশি সুখী
আঘ্রাত গোলাপ। একাকী ফুটেছে যে ফুল,
একাকী যে গেছে মরে কোথায় পরিপূর্ণতা তার?

হার্মিয়া। একাকীই ফুটবো প্রভু, ঝরে যাবো একাকী
তবু নেব না কাঁধে পিতার অন্যায় আদেশের জোয়াল,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেব না কাউকে আমার কুমারী দেহের স্বাদ।

থিসিয়াস। সময় নাও, বিবেচনা করো। শুক্লপক্ষের আগমনে
আমার বাকদত্তা হবেন আমার জীবনসংগিনী:
সেইদিন চাই উত্তর--হয় নেবে প্রাণদণ্ড পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের দায়ে,
অথবা ডিমিট্রিয়াস-কে করবে বরণ পিতার আদেশ মেনে,
অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত নেবে
ডায়না দেবীর মন্দিরে।

ডিমিট্রিয়াস। জিদ ছেড়ে দাও, হর্মিয়া! আর লাইস্যাণ্ডার,
আমার অধিকার মেনে তোমার পাগলের দাবী প্রত্যাহার করো।

লাইস্যাণ্ডার। ওর পিতা তোমাকে ভালবাসেন, ডিমিট্রিয়াস,
আবার হার্মিয়ার ভালবাসায় ভাগ বসাচ্ছো কেন?
তুমি বরং ওর পিতাকেই বিয়ে করো।

ইজিয়াস। উদ্ধত লাইস্যাণ্ডার! হ্যাঁ, ডিমিট্রিয়াস আমার প্রিয়পাত্র।
প্রিয়পাত্রকেই দিয়ে যাবো আমার সর্বস্ব।
আমার কন্যা আমার—স্থাবর অস্থাবরের সংগে কন্যাও
ডিমিট্রিয়াসেই বর্তাবে।

লাইস্যাণ্ডার। কেন হুজুর? আমার বংশগৌরব বা টাকাকড়ি
ওর চেয়ে কম কিসে? ওর চেয়ে ঢের বেশি আমার ভালবাসা।
আর এই সব ভূয়ো দম্ভের চেয়ে বড় যোগ্যতা আমার—
সুন্দরী হার্মিয়া আমায় ভালবাসে।
তবে আমার অধিকার খাটাবো না কেন?
ঐ ডিমিট্রিয়াস সম্বন্ধে এইটুকু বলবো—প্রেম নিবেদন করেছে সে
ইতিপূর্বে নেডার-কন্যা হেলেনা-কে।
সে বেচারী প্রাণমন দিয়ে প্রতিমা গড়ে ভালবাসে পুজো করে

এই চরিত্রহীন বিশ্বাসঘাতককে।

থিসিয়াস। স্বীকার করছি ব্যাপারটা কিছু কিছু শুনেছি।
রোজই ভাবি ডিমিট্রিয়াস-কে ডেকে বলবো দুচার কথা।
কিন্তু কাজে কর্মে আর হয়ে ওঠে না। এবার যখন পাওয়া গেছে—
ডিমিট্রিয়াস এস, তুমিও এস ইজিয়াস, আমার সংগে এস।
একান্তে বসে তোমাদের কিছু শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।
আর রূপবতী হার্মিয়া, খুব সাবধান, চপল চটুল খেয়ালগুলোকে
পিতার পায়ে বিসর্জন দাও।
অন্যথায় এথেনস্ নগরীর আইনে তুমি দণ্ডার্হ,
কোনোমতেই সে আইনের হবেনা নড়চড়—
হয় মৃত্যু, না হয় চিরকুমারীর ব্রত।
এস হিপোলিটা, একি, মুখ আঁধার কেন?
এস ইজিয়াস।

ইজিয়াস। প্রভুর আদেশ আনন্দের সংগে শিরোধার্য।

[লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

লাইস্যাণ্ডার। কি হয়েছে হার্মিয়া? মুখ বিবর্ণ কেন?
গালের গোলাপী আভা এত শীঘ্র কেন লীণ?

হার্মিয়া। অনাবৃষ্টিতে মনের গোলাপ ঝরে গেছে লাইস্যাণ্ডার,
এখন অশ্রুরাশি ছাড়া কোথাও রস নেই।

লাইস্যাণ্ডার। যা পড়েছি, যা শুনেছি, ইতিহাসে কাব্যে গল্পে,
সবেতেই দেখি শুধু প্রেমের সর্পিল গতি।
কিন্তু গল্পেও একটা কারণ থাকে—হয় বংশের গরমিল,—

হার্মিয়া। উচ্চবংশের গরিমায় দরিদ্রকে প্রত্যাখ্যান—

লাইস্যাণ্ডার। অথবা বয়সের পার্থক্য—

হার্মিয়া। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—

লাইস্যাণ্ডার। অথবা খল বন্ধুর ঘটকালিতে বিবাহ হওয়ার ফলে—

হার্মিয়া। অন্যের নির্বাচিত স্বামীর পায়ে প্রেম ঢালতে হবে?
এ অবিচার!

লাইস্যাণ্ডার। আরো দেখেছি, যেখানে প্রকৃত ভালবাসা বিকশিত হয়েছে
সেখানেও এসেছে যুদ্ধ, মৃত্যু আর ব্যাধির অবরোধ;
প্রেম হয়েছে ক্ষণস্থায়ী—একটা ধ্বণির মতন। তারপর—
নিমেষের মধ্যে আকাশ ভেঙে, পৃথিবী কাঁপিয়ে,
মানবকণ্ঠে একটি কাতরোক্তি উত্থিত হওয়ার আগেই,
অন্ধকারের মুখের বিবরে লুপ্ত হয়েছে প্রেম।
সব উচ্ছলতার এই সমাপ্তি।

হার্মিয়া। প্রেমিক মাত্রেরই যদি এত বাধা আর বিপত্তি
তবে তো এ অদৃষ্টের অলঙ্ঘ্য বিধান।
তবে এস শত দুঃখেও ধরি ধৈর্য।

প্রেমের উন্মেষমাত্র যেমন আসে ভাবনার রাশি,
যেমন আসে স্বপ্ন আর দীর্ঘশ্বাস, আশা আর আনন্দাশ্রু,
মানুষের অসহায় প্রেমের যারা চিরসাথী,
তেমনি আসুক বিরহ, চিরকাল যেমন এসেছে।

লাইস্যাণ্ডার। ঠিক ধরেছ। এবার আমার কথা শোনো, হার্মিয়া,
আমার এক মাসী আছেন, বিধবা, ধনী, সন্তানহীন।
তাঁর গৃহ এথেন্স্ থেকে সাড়ে দশ ক্রোশ দূরে।
আমাকেই তিনি করেন স্নেহ নিজের ছেলের মতন।
ঐখানে প্রিয়া হার্মিয়া, বিয়ে হবে আমাদের;
রাজধানীর খরশান আইনের নাগালের বাইরে।
যদি আমায় ভালবাসো তুমি, তবে কাল নিশুত রাতে
পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পালিয়ে যেও বনে—
সেই যেখানে হেলেনার সাথে মে-মাসের এক প্রভাতকে
জানিয়েছিলে প্রণাম। সেইখানে থাকবো আমি।

হার্মিয়া। প্রিয়তম লাইস্যাণ্ডার।
কন্দর্পের পুষ্পধনু সাক্ষী আমার,
তাঁর সোনার তীর আমার দিব্যি, শপথ করছি
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধেন যিনি সেই ভিনাস দেবীর বাহন
শুভ্রকপোতের নিষ্পাপ নামে—
দূরে সমুদ্রবক্ষে ট্রোজান প্রেমিকের জাহাজ দেখে
কার্থেজ-অধীশ্বরীর বুকে জলেছিল যে পুণ্যপ্রেমের বহ্নি
সেই হোমাগ্নি ছুঁয়ে করছি শপথ—
যে অসংখ্য প্রেমের প্রতিজ্ঞা আজ পর্যন্ত ভেঙেছে পুরুষ
নানা দেশে নানা কালে, তার নামে করছি শপথ—
কালকে যথাসময়ে যথাস্থানে আসবো তোমার কাছে।

লাইস্যাণ্ডার। কথা দিয়েছ, খেলাপ কোরোনা যেন। ঐ দেখ হেলেনা আসছে।

[হেলেনা-র প্রবেশ]

হার্মিয়া। আয় আয় সুন্দরী হেলেনা, কোথায় চলেছিস?

হেলেনা। সুন্দরী বলছো আমায়? বলো না, ফিরিয়ে নাও কথা।
ডিমিট্রিয়াস-এর চোখে তুমিই একমাত্র সুন্দর।
তোমার চোখে চুম্বকের মতন টানে ওকে; তোমার কথা
গান হয়ে ওঠে দোয়েল-শ্যামার কূজনকে মানায় হার।
শস্য যখন শ্যামল হয়, কাশের বনে শাদার মেলা,
শুনেছি তখন অসুখবিসুখ ছোঁয়াচে হয়। চেহারা কেন
ছোঁয়াচে হয় না হার্মিয়া? তোর রূপটা আমায় লাগেনা কেন?
তোর চোখ আমার হয় না? তোর গলার গানগুলো সব
আমার গলায় বসে না? জগৎটা যদি আমার হোতো,
ডিমিট্রিয়াস-এর মন পেতে সব দিতাম তোকে,

বিনিময়ে তোর চেহারা আমার যদি হোতো।
শেখা না আমাকে হার্মিয়া, কি করে রূপ মেলে ধরিস,
কি কৌশলে তুই ডিমিট্রিয়াসের হৃদয় নিয়ে খেলিস।

হার্মিয়া। কি জানি, হেলেনা, আমি চোখ রাঙাই, তবু ভালবাসে।

হেলেনা। আমি যে হেসেও আনতে পারিনা পাশে!

হার্মিয়া। আমি দিই অপমান, তবু দেয় ভালবাসা।

হেলেনা। আমি প্রার্থনা করি, তবু যে পোরেনা আশা।

হার্মিয়া। যতই ঘৃণা করি, ততই কাছে আসে।

হেলেনা। যতই কাছে যাই, ততই ঘৃণায় হাসে।

হার্মিয়া। ও মজে গেছে, হেলেনা, আমার দোষ নেই।

হেলেনা। দোষ আছে তোর রূপ—সে দোষ আমার কেন নেই?

হার্মিয়া। আর ভাবিস নে, আমার মুখ আর ও দেখতে পাবেনা।
লাইস্যাণ্ডার আর আমি পালাবো এখান থেকে।
লাইস্যাণ্ডারের সংগে যখন দেখা হয়নি, এই এথেন্স্
ছিল আমার স্বর্গ। তবেই দেখ্ আমার প্রেমে আছে কি জিনিষ,
সেই স্বর্গ নরক হয়েছে, অমৃত আজ বিষ।

লাইস্যাণ্ডার। হেলেন, তোমায় বলছি খুলে ঃ কাল রাতে চাঁদ যখন বনের পুকুরে
দেখবে নিজের রূপোলী মুখ জলের মুকুরে,
ছুঁইয়ে দেবে মুক্তোবিন্দু মাঠের ঘাসে ঘাসে,
অন্ধকারে পালাবো আমরা চিরমুক্তি আশে,
নগর-প্রাকার পেছনে ফেলে নিঃশব্দে চুপিসারে।

হার্মিয়া। আর বনের মধ্যে সেই যেখানে তুই আর আমি
শিউলি ফুলের যে বিছানায় কাটিয়েছি রাত
মনের কথা বলেছি তোকে রেখে হাতে হাত
সেইখানেতে লাইস্যাণ্ডার দেবে গলায় হার
চলে যাব দুজনেতে; ফিরবো নাকো আর।
খুঁজে নেব নূতন পড়শী, বন্ধু নূতন দেশে—
বিদায় বন্ধু, চললাম এবার অজানাতে ভেসে।
ভগবান করুন যেন ডিমিট্রিয়াস-কে তুই পাস;
লাইস্যাণ্ডার, কথা রেখো, ছিঁড়ে দাও বাহুপাশ;
কাল মাঝরাতের আগে আর হবে নাক' দেখা
অ-দেখার ক্ষুধা থাকুক প্রেমের চোখে লেখা।

লাইস্যাণ্ডার। তাই হোক হার্মিয়া।

[হার্মিয়ার প্রস্থান]

হেলেনা, বিদায়।
তোমার প্রাণ-ভরা ভালবাসার প্রতিদান দেয় যেন
ডিমিট্রিয়াস!

[লাইস্যাণ্ডার-এর প্রস্থান]

হেলেনা। কারুর পৌষমাস কারুর ভীষণ সর্বনাশ।
রূপের খ্যাতি এই শহরে আমারই বা কি কম?
হলে হবে কি, ডিমিট্রিয়াস তো তা দেখেও দেখেনা।
সবাই যা জানে তাই যেন সে জানে না।
হার্মিয়া-র চোখ দেখে ডিমিট্রিয়াস পাগল,
আর ডিমিট্রিয়াস-এর মুখ দেখে আমিও তাই।
সবচেয়ে ঘৃণ্য যে জীব, দোষ যার অপরিমেয়,
প্রেম তাকেও মহান করে শ্বাশ্বত সুন্দর।
প্রেম চোখে দেখেনা, দেখে মনে।
তাই লোকে বলে আকাশচারী মদনদেব অন্ধ।
প্রেমের নেই বুদ্ধি, বিবেচনা; আছে গতি, নেই দৃষ্টি,
দিশেহারা তার ছুটোছুটি। খেয়ালি সে শিশুর মতন।
ভুল করা তার খেলা। দুরন্ত শিশুর মেলায় তাই
অর্থহীন ভুলের মেলা—কাঁদায় যেমন, নিজেও কাঁদে তত।
হার্মিয়া-র দৃষ্টিজালে ধরা পড়ার আগে
এই ডিমিট্রিয়াসই বেসেছে আমায় ভাল, শপথ করে বলেছে শুধু
সে আমার, সে আমার। শিলাবৃষ্টির মতন শপথের রাশি।
তারপর হার্মিয়ার প্রেমের উত্তাপে সে শিলা গলে গেছে,
শপথের রাশি মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।
আমি ওকে বলে দেব—হার্মিয়া পালিয়েছে।
জানি, ছুটবে সে বনের দিকে প্রেমাস্পদের খোঁজে।
তবু বলবো। হয়তো বৃথা অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে
ফিরে আসবে আমার বাহুডোরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। কুইন্‌স্‌-এর গৃহ।

কুইন্‌স্‌ স্নাগ, বটম, ফ্লুট, স্নাউট এবং ষ্টার্ভলিং-এর প্রবেশ

কুইন্‌স্‌। আমরা সবাই জড়ো হয়েছি?

বটম্‌। আমার মনে হয় পাণ্ডুলিপি—অনুসারে একে একে হাজিরা নিলে ভাল হয়।

কুইন্‌স্‌। এই কাগজে লেখা আছে প্রত্যেকের নাম—অর্থাৎ এথেন্‌স্‌-অধিপতি এবং তাঁর স্ত্রীর বিবাহোপলক্ষ্যে তাঁদের সামনে যে নাট্যাভিনয় হবে তাতে যাঁরা অভিনয় করতে সক্ষম বলে শহরের সবাই একমত—তাদের নাম লেখা আছে এই কাগজে।

বটম্‌। বন্ধুবর পিটার কুইন্‌স্‌, প্রথমে বলো নাটকটা কি বিষয় নিয়ে লেখা; তার-পরে পড়ো অভিনেতাদের নাম; এবং এইভাবে মোদ্দা কথায় উপস্থিত হও।

কুইন্‌স্‌। তবে শোনো। আমাদের এই নাটকের নাম—পিরামুস এবং থিসবি-র গভীর বিষাদান্তক কৌতুকনাট্য—তথা তাদের ভয়াবহ মৃত্যু-কাহিনী।

বটম্‌। হুঃ, আমি পড়েছি, দারুণ লেখা। আবার তেমনি মজার। এইবার বন্ধুবর পিটার কুইন্‌স্‌ কাগজ দেখে অভিনেতাদের নাম ডাকো। বন্ধুগণ, আপনারা ছড়িয়ে দাঁড়ান।

কুইন্‌স্‌। যেমন যেমন নাম ডাকবো, তেমন তেমন জবাব দেবে। তাঁতী নিক্‌ বটম!

বটম্‌। উপস্থিত। আমায় কি পার্ট করতে হবে বলো। বলো পরের নাম পড়ো।

কুইন্‌স্‌। নিক্‌ বটম্‌, তোমাকে পিরামুস-এর পার্ট করতে হবে।

বটম্‌। পিরামুস কি? প্রেমিক, না খল-নায়ক?

কুইন্‌স্‌। প্রেমিক, প্রেমের জন্যে সে বীরের মৃত্যু বরণ করবে।

বটম্‌। হুঃ, ওরকম পার্ট ভালমতো করতে গেলে কয়েক আঁজলা চোখের জল দরকার হবে। আমি যদি ও পার্ট করি তবে দর্শকের চোখে বাণ ডাকবে বলে দিলুম। ঝড় ওড়াবো। কারুণ্যের অত্যাধিক্য করবো। হ্যাঁ, এবার পড়ো। তবে এটুকু বলতে পারি খল-নায়ক বা অত্যাচারী রাজার পার্টই আমার আসে ভাল। যমরাজের পার্টে আমি অত্যুৎসাধারণ। স্রেফ গলা ছেড়ে একটা বেড়াল ছিঁড়ে খান খান করতে পারি, জানো? ফাটাতে পারি।

তর্জন গর্জন প্রস্তর
ডমরু ডম ডম অম্বর
চারিদিক ভাঙা দ' ভংকর
　　কারাগার প্রাচীর ভাঙে খালি—
সূর্যরথের ঘড় ঘড়
রোদ আসে থর থর
রাত ছেঁড়ে চড় চড়
　　বোকা ভাগ্যের মুখে চুণকালি।

কি উচ্চ ভাব! হ্যাঁ, এবার অন্যান্য অভিনেতাদের নাম ডাকো। এটা বুঝলে— এটা হোলো গিয়ে যমরাজের ভূমিকার সুর। প্রেমিকের ভূমিকা অনেক মোলায়েম, অনেক করুণাতিশয্য।

কুইন্‌স্‌। ফ্রান্সিস্‌ ফ্লুট, হাপর-ওয়ালা, কোথায়?

ফ্লুট। এই যে আমি।

কুইন্‌স্‌। ফ্লুট, তোমাকে থিসবি করতে হবে।

ফ্লুট। থিসবি কি? যোদ্ধা?

কুইন্‌স্‌। থিসবি হোলো পিরামুস-এর প্রেমিকা।

ফ্লুট। না, না, আমাকে মেয়ের পার্ট দিও না, মাইরি বলছি। আমার দাড়ি গজাচ্ছে।

কুইন্‌স্‌। তাতে ক্ষতি নেই। মুখোশ পরে করবে তো। গলাটাকে শুধু যত সরু পারো করে নিও।

বট্‌ম্‌। মুখোশ পরে মুখই যদি ঢাকা যাবে, তবে থিসবি-ও আমিই করি না কেন? গলাটাকে অতীব প্রচণ্ড রকমের মিনমিনে করে তাক লাগিয়ে দেব। থিসনি কোথা থিসনি! হেথায় পিরামুস প্রিয়তম মোর, এই যে হেথা তব থিস্‌বি, তব প্রিয়া ভার্যা!

কুইন্‌স্‌। না, হবে না। তোমাকে পিরামুস করতে হবে, আর ফ্লুট করবে থিসবি।

বট্‌ম্‌। তাহলে তাই হবে। পড়ো।

কুইন্‌স্‌। *দরজী রবিন ষ্টার্ভলিং!*

ষ্টার্ভলিং। *এই যে, পিটার কুইন্‌স্‌।*

কুইন্‌স্‌। রবিন ষ্টার্ভলিং, তুমি করবে থিসবি-র মা। কামার টম স্নাউট।

স্নাউট। এই যে পিটার কুইন্‌স্‌।

কুইন্‌স্‌। তুমি পিরামুস-এর বাবা; আমি, থিসবি-র বাবা; মিস্ত্রী স্নাগ—তুমি করবে সিংহের পার্ট। ভূমিকা বণ্টন শেষ হোলো, নাটক নামালেই হয়।

স্নাগ। সিংহের পার্টটা লেখা আছে? যদি থাকে তো আমাকে আগেভাগে দিয়ে দিও। আমার পড়তে একটু সময় লাগে।

কুইন্‌স্‌। ও পার্ট স্টেজে উঠেই মেরে দিতে পারবে। কারণ কথা তো নেই, শুধু গর্জন।

বট্‌ম্‌। সিংহের পার্টটাও আমাকে দাও ভাই। এমন গর্জন করবো যে মহারাজ বলে উঠবেন—"এংকোর, আবার গর্জন হোক, আবার গর্জন হোক!"

কুইন্‌স্‌। খুব বেশি ভয়ংকর গর্জন করলে মহারাণী আর দরবারের মহিলারা সব ভড়কে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন। তাহলে আর দেখতে হবে না, আমাদের গর্দানে যাবে।

সকলে। হাঁ, হাঁ, গর্দান হবে, সবকটা বাপের বেটা যমের বাড়ি যাবো!

বট্‌ম্‌। তা বটে। এটা আমি অনস্বীকার করি। ঘাবড়ে গেলে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়; আর বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেলে আমাদের কোতল করতে কতক্ষণ? বেশ, তবে আমি গলাটাকে অপকৃষ্ট করে এমন মোলায়েম গর্জন ছাড়বো যে মনে হবে পায়রা বক-বকম করছে, এমন গর্জন করবো যে মনে হবে গাছের মাথায় বউ-কথা-কও-এর বউ অবশেষে কথা কইলো।

কুইন্‌স্‌। না, পিরামুস ছাড়া আর কোনো পার্ট তোমার করা চলবে না। কারণ পিরামুস-এর সুন্দর চেহারা খাঁটি ভদ্রলোকের মতন। মানে চৈত্রদিনে যাঁরা বেড়াতে বেরোন তেমনিধারা রূপসী ভদ্দরলোক। তাই তুমি ছাড়া ও পার্ট কে করবে?

বট্‌ম্‌। বেশ, উৎরে দেব 'খন। কি রকম দাড়ি নিলে ভাল হয় বলো তো?

কুইন্‌স্‌। তোমার যেমন খুশী।

বট্‌ম্‌। তাহলে পাকা-ধান- রং-এর দাড়ি পরিধান করেই নির্বাহ করা যাবে। অথবা মেহ্‌দি বা কমলা রং-এর দাড়ি। অথবা কালো-বেগুনি দাড়ি। অথবা সোনার মোহরের মতন ক্যাটক্যাটে হলদে দাড়ি।

কুইন্‌স্‌। সোনার মোহরে যে রাজার ছবি দেখি তার তো চুলই নেই—মাকুন্দ, মাথায় টাক। তবে কি দাড়ি ছাড়াই নামবে নাকি? থাক্‌, এই নাও পার্ট। বন্ধুগণ, আমার মিনতি, আমার অনুরোধ আমার নিবেদন—কাল রাত্রের মধ্যে পার্ট টার্ট শিখে শহরের বাইরে বনের মধ্যে চাঁদের আলোয় আমার সংগে দেখা কোরো। ঐখানে মহড়া দেব। শহরের মধ্যে হৈ চৈ করলে লোক জমে যাবে, সবাই জেনে ফেলবে। ইতিমধ্যে অভিনয়ের জন্য যে যে জিনিস লাগবে আমি তার তালিকা তৈরী করবো। আমার অনুরোধ—কেউ মহড়া থেকে কেটে পোড়ো না।

বটম্‌। ঐখানে দেখা হবে। খুব কষে, বীরদর্পে, অশ্লীলরূপে মহড়া দেয়া যাবে।

খেটে পার্ট শিখো সবাই, একটা কথাও যেন না ভোলে কেউ। চলি!

কুইন্‌স্‌। তাহলে বনের মধ্যে দেখা হবে।

বটম্‌। আর বলতে হবে না। আমাদের ধনুর্ভংগপণ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্‌স্‌-এর উপকণ্ঠে অরণ্য।

দুই দিক হইতে যথাক্রমে পাক্‌ এবং পরীর প্রবেশ

পাক্‌। কিগো নিশাচরী! চলেছিস কোথায়?

পরী।
ভূধর থেকে ভূমিতে ছুটেছি,
　　ঝোপঝাড় লতাপাতা,
তেপান্তর আর সায়র দেখেছি,
　　আগুনের ফাঁদ পাতা,
ঘুরে বেড়াই জগৎ জুড়ে
　　চাঁদের থেকে অনেক জোরে;
পরীরানীর ভৃত্য বটে
ছড়াই মালা সবুজ মাঠে;
ডোরাকাটা সরষে ফুলের সারী
সবাই তারা রানীর সহচরী;
সরষে ফুলের পাপড়িতে লাল বুটি
মরকতের গয়না পেয়েছে রানীর স্নেহ লুটি।
হুকুম হয়েছে আমার পরে খুঁজে প্রতি ফুল
শিশিরবিন্দু দিয়ে তাদের গড়িয়ে দিতে দুল।
দুষ্টু ছেলে বিদায় দে রে, সময় বয়ে যায়
পরীরানী সদলবলে আসছে রে হেথায়।

পাক্‌। পরীরাজও এইখানে যে আমোদ করতে চায়—
দেখিস যেন পরীরানী সামনে না তার যায়।
পরীর রাজা ওবেরন, আজ বিষম খেপে গেছে,
(কারণ) ভারতবাসী ছেলেটাকে রানী নিয়ে গেছে।
ফুটফুটে ঐ বাচ্চাটাকে ভারত থেকে আনিয়ে
রানী তাকে দিল কিনা নিজের চাকর বানিয়ে!
ক্রুদ্ধ রাজার শুদ্ধ সাধ ছেলেটাকে ধরে
অনুচর ক'রে তাকে ঘোরে বনান্তরে।
রানীর আবার তেমনি জেদ কিছুতেই না ছাড়ে,
ফুলের মুকুট পরায় তাকে চোখের মণি ক'রে

তাই এখন রাজা রানীর যেথায় দেখা হয়
মাঠে, ঘাটে, বনের ধারে
স্ফটিক ধারা ঝর্ণা ধারে
দুজনেতে প্রাণ-কাঁপানো ঝগড়াঝাঁটি হয়।
আর পরীরা সব কাঁপতে কাঁপতে
লুকোয় ডুমুর ফুলের মধ্যে,
রাজা-রানীর দেখা হলেই ভূমিকম্প হয়!

পরী। তোকে যেন চিনিচিনি খালি মনে হয়।
তোর নাম না রবিন ভায়া? দুষ্টুমি তোর পেশা!
গাঁয়ে ঢুকে মেয়েদের তোর ভয় দেখানো নেশা!
মাখন তোলার মরশুমে তুই যাদু করিস হাঁড়ি,
ব্যর্থ হাতা ঠেলে হাঁপায় গাঁয়ের যত বুড়ি।
তোর জন্যেই তো মদের পিঁপেয় গেঁজলা ওঠে শুধু,
রাতের পথিক পথ হারায় মাঠের মধ্যে ধু ধু।
তাই দেখে তোর পেট ফেটে হাসি আসে।
তুই-ই তো সে?

পাক্। ঠিক ধরেছিস ওরে—
আমিই সেই মজা-লোটা রাতের ভবঘুরে।
ফোড়ন কেটে ওবেরনের মুখে ফোটাই হাসি;
মজা দিতে রাজার প্রাণেই দুষ্টুমির রাশি।
মাদীঘোড়ার ডাক ডেকে যাই মোটকা ঘোড়ার কাছে,
গরম হয়ে মোটকা ঘোড়া খটখটাখট নাচে।
মাঝে মাঝে গিয়ে সেঁধুই গরম তাড়ির পাত্রে,
যখন গাঁয়ের বুড়ির দল আড্ডা মারে রাত্রে।
যেমনি বুড়ি পাত্র তুলে চুমুক মারতে যায়,
টগবগিয়ে উঠে তাড়ি ঢালি বুড়ির গায়।
গাঁয়ের যিনি বদ্যিবুড়ি, বলেন করুণ গল্প;
বলতে বলতে চৌকী খোঁজেন, চোখে দেখেন অল্প,
মাঝে মাঝেই আমায় তিনি চৌকী বলে ভুল করেন,
বসতে গেলেই এই শর্মা শুট করে দৌড় মারেন,
ধপাস পড়ে কাশতে কাশতে বৃদ্ধা ভির্মি যান;
পাছার তলে চৌকি নেই যে! বসতে কোথায় পান?
ততক্ষণে হাসির হর্‌রা উঠছে ঘরময়,
সবে পেট ধরে হাসতে হাসতে গলদঘর্ম হয়।
এমন মজা বল্ দেখি তুই আর কিসে হয়?
ও বাবা! পালা বলছি! ঐ আসছেন রাজা!

পরী। যেখানেতে বাঘের ভয় সেইখানেতে সন্ধ্যে হয়—
ঐ আসছেন রানী!

[একদিক হইতে অনুচর সমভিব্যাহারে ওবেরন-এর প্রবেশ; অন্যদিক হইতে সদলবলে টিটানিয়া-র]

ওবেরন। চন্দ্রালোকে এ কি অশুভ সাক্ষাৎ, উদ্ধত টিটানিয়া!

টিটানিয়া। এ যে দেখি হিংসুটে ওবেরন! পরীর দল, চল চলরে চল্!
এর ছায়া মাড়াবো না।

ওবেরন। দাঁড়াও স্পর্ধিত নারী! আমি কি তোমার স্বামী নই?

টিটানিয়া। তবে আমাকে তোমার স্ত্রী বলে মানো কি? জেনেছি সব—
পরীর দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে, মেষপালকের বেশে
সারাদিন ধরে বাজিয়ে বাঁশী, ভালবাসার গান গেয়ে গেয়ে
প্রেম নিবেদন করেছ তুমি কামুক ফিলিডা-কে।
আজ হঠাৎ ভারতবর্ষের তৃণভূমি ছেড়ে,
হেথায় কি মনে করে? তাও জেনেছি আমি।
ভূতপূর্ব প্রেমিকা তোমার ষণ্ডামার্কা মেয়ে,
সেই যে বর্ম এঁটে যুদ্ধ করে পুরুষ সেনার সাথে—
সেই কনে'র বিয়ে হবে থিসিয়াসের সাথে। তাই
সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে আসা।

ওবেরন। কোন লজ্জায়, টিটানিয়া, হিপোলিটার নাম নিচ্ছ মুখে?
তোমার সাথে থিসিয়াসের গুপ্তপ্রেম যখন জানি আমি?
পেরিজিনিয়া-র প্রেমে যখন থিসিয়াস আকুল,
হাত ধরে তার হেঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে
জ্যোৎস্না-রাতে করেছিলে ফেলি। থিসিয়াস্ কাউকে কথা দিলেই
ভাংচি দাও কেন? এগ্‌ল্, আরিয়াড্‌নে আর আণ্টিওপা—
তিনজনকেই শপথ ভেঙে ঠকিয়েছে থিসিয়াস,
শুধু তোমার প্ররোচনায়।

টিটানিয়া। এসব হচ্ছে অন্ধ ঈর্ষার ব্যর্থ জালিয়াতি।
ফাগুন মাসের গোড়া থেকে যেথায় দেখা হচ্ছে,
উপত্যকা, পাহাড়, পর্বত, মাঠে-ঘাটে, বনে,
পাথরে ঘেরা নির্ঝরিণীর নির্জন দুই কূলে,
বা বালির 'পরে বেলা যেথায় মিশেছে সমুদ্রে
শিস দিয়ে বাতাস যেথা চুল নিয়ে খেলে,
সেথায়ই তোমার হাঁকডাকে শান্তিভংগ হচ্ছে।
বাতাস তার বাঁশির সুর শোনাতে না পেরে
অভিমানে নিচ্ছে শুষে সাগরপুরীর কুয়াশা,
দিচ্ছে ঢেলে জটপাকানো সেই কুয়াশা ডাঙায়;
রাশি রাশি জলের কণায় নদ-নদী-খাল-বিল
বিনয় ভুলে উঠছে ফেঁপে গগনচুম্বী দম্ভে,
ভাঙছে যত গণ্ডিসীমা ডাঙার রাজত্বের।
বৃথাই কৃষক মাথার ঘাম ফেলছে পায়ের 'পরে,

কিশোর ফসল পেতে না পেতে যৌবনের স্বাদ
পচছে মাঠে বানের জলে, অকালেরই মৃত্যুতে।
শূন্য গোয়াল করছে খাঁ খাঁ জলে-ডোবা মাঠের মাঝে,
মরা গরুর মাংস খেয়ে ফুলছে শকুন কাকের দল।
লুকোচুরি খেলার মাঠে জমেছে আজ পাঁক।
চটুল মাঠের সবুজ গায়ে পায়ে-চলা পথের রেখা
পায়ের স্পর্শ না পেয়ে পেয়ে হয়েছে বিলীন।
অপ্রাকৃত চৈত্র-ঝড়ে, অকাল বর্ষার উত্তাপে
চাইছে মানুষ শীতের আমেজ, অসহায় তার প্রার্থনা,
চাইছে উঠতে মুখর হয়ে নবান্নের জয়গানে।
তাই বন্যা-রানী চন্দ্রদেবী ক্রোধ-বিবর্ণ মুখে
কাকজ্যোৎস্নায় ভরিয়ে রাখে আকাশ-বাতাস জগৎ;
অভয় পেয়ে জল বাড়ে, মড়ক লাগে গাঁয়ে গাঁয়ে।
চারিদিকে অঘটন ঋতুচক্র এলোমেলো,
কৃষ্ণচূড়ার ভাঁজে ভাঁজে শুক্লকেশ তুষার রাশি;
শীত এসেছে মাথায় প'রে বরফ-কুচির মুকুট,
তার পরে গুঁজেছে সে গ্রীষ্মফুলের স্তবক,
হিমশীতল উষ্ণীষে আজ বর্ণ-গন্ধের মেলা,
নিষ্ঠুর পরিহাসে। বসন্ত আর রুদ্র বৈশাখ,
মাতৃমূর্তি শরৎ আর ক্রোধোন্মত্ত পৌষ--
নিয়ম ভেঙেছে, পরেছে বিচিত্র নূতন বেশ,
এসেছে সবাই একসাথে চোখ-ধাঁধানো জৌলুষে
আলাদা করে চিনতে মানুষ মেনেছে হার, প্রচণ্ড বিস্ময়ে।
এই দুর্দৈবের মিছিল এসেছে তোমার আমার কলহ থেকে;
আমরা এদের জনক-জননী, দায়িত্ব আমাদের।

ওবেরন। সহজেই হয় দুঃখ-নিবারণ, তোমার হাতেই কলকাঠি--
ওবরেন-এর সংগে কেন লাগতে আসে টিটানিয়া?
ভিক্ষা চেয়েছি একটি বালক, সামান্য এক ভৃত্য,
দিয়ে দিলেই তো হয়।

টিটানিয়া। ও ব্যাপারে থাকো নিশ্চিন্ত
পুরো পরীরাজ্য আমায় দিলেও পাবে না সেই বালককে।
ওর মা ছিল ভক্ত আমার, রাতের পর রাত
ভারতবর্ষের মৃদুমন্দ গন্ধবহ সমীরণে
কত কথা বলেছি দুজনে। বসেছি দুজনে
বরুণদেবের হলুদ রঙের বালির 'পরে
দূরে দেখেছি পুরুষ বাতাসের কামোন্মত্ত স্পর্শে
কুমারী জাহাজের পালের জঠর সম্ভাবনায় স্ফীত;
হাসতে হাসতে সাঁতরে গিয়ে জাহাজ থেকে এনেছে চেয়ে

আমার জন্যে কত রকমের পণ্য। কিন্তু মানুষ নশ্বর;
ঐ ছেলেটির জন্ম দিতে ভক্ত আমার গিয়েছে চলে--
তারই তরে মানুষ করছি অনাথ ঐ বালককে
তার পুণ্যস্মৃতির সম্মানেই করছি তোমায় বিমুখ।

ওবেরন। কতদিন এই বনে থাকবার মতলব তোমার?

টিটানিয়া। থিসিয়াস-এর বিবাহের দিন পর্যন্ত তো বটেই।
ল্যাজ গুটিয়ে মাথা গুঁজে নাচতে যদি পারো,
চন্দ্রালোকে যোগ দেবে চলো পরীর উৎসবে।
নইলে আমার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলো বলে দিলাম সাফ কথা,
আমিও থাকবো দূরে দূরে।

ওবেরন। ঐ ছেলেটা আমায় দাও, যাব তোমার সংগে

টিটানিয়া। তোমার পরীরাজ্য পেলেও নয়। চল্ সবাই, সরে যাই,
আর থাকলে কিছুক্ষণ উঠবে ঝগড়া চরম সীমায়।

[সদলবলে টিটানিয়া-র প্রস্থান]

ওবেরন। বেশ। যাচ্ছ, যাও! এই অপমানের জবাব দেব;
বিপর্যস্ত হয়ে তবে এ বন থেকে মুক্তি পাবে।
পাক্, তুই বড়ো ভাল ছেলে, আয় দেখি এদিকে!
মনে পড়ে একদিন বসে ছিলাম সাগরপারে?
শুনেছিলাম দূরাগত জলপরীর গান;
সংগীতের হিন্দোলে বর্বর ঢেউ শান্ত হোলো
নভশ্চারী তারার দল পাগল হয়ে পড়ল ঝুঁকে
শুনতে সে বসন্তের বোধন? মনে আছে?

পাক্। মনে আছে।

ওবেরন। ঠিক সেই মুহূর্তে তোর চোখে পড়েনি, কিন্তু আমি দেখলাম,
তাপসী চাঁদ আর নিদ্রিত পৃথিবীর মাঝখানে, অন্তরীক্ষে
ধনুক হাতে কন্দর্প স্বয়ং। ঠিক সেই সময়ে,
পশ্চিম দিগন্তের সিংহাসন ছেড়ে উঠেছিলেন বিশাখা নক্ষত্র,
শুভ্র পূজারিণী-বেশে চলেছেন তিনি চন্দ্র-প্রণামে।
তাঁর হৃদয় লক্ষ্য করে প্রেমের শর সন্ধান করলেন মদন।
কিন্তু ভক্তবৎসলা চন্দ্রদেবী কিরণকণার জাল মেলে ধরে
লক্ষবক্ষভেদী অজেয় তীরকে করলেন পরাহত।
আকাশের মন্দিরের আনমনা পূজারিণী বিশাখা
এগিয়ে চললেন নিরুদ্বিগ্ন তীর্থযাত্রায়।
তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ্য করলাম কোথায় পড়লো তীর--
পড়লো পশ্চিম উপকূলে। একটি শ্বেতশুভ্র পুষ্পের 'পরে—
মুহূর্তে সে ফুল প্রেমের ব্যথায় হয়ে গেল নীল।
গাঁয়ের মেয়েরা ঐ ফুলের নাম দিয়েছে অলস-প্রেম।
নিয়ে আয় সে ফুল; বলেছি তোকে কোথায় পাওয়া যাবে;

ঘুমন্ত মানুষের মুদিত আঁখি পল্লবে
সে ফুলের রস একফোঁটা মাত্র দিলে,
পুরুষ হোক, হোক না মেয়ে, জেগে উঠেই দেখবে যাকে সামনে,
পাগলের মতন তক্ষুণি তাকে ভালবাসবে।
নিয়ে আয় সেই ফুল: জলজ জন্তু আধ ক্রোশ যেতে না যেতে,
ফিরে আসা চাই।

পাক্। অর্ধপ্রহর যেতে না যেতে পাকদণ্ডি দিয়ে
মুড়তে পারি পৃথিবীটাকে [প্রস্থান]

ওবেরন। ফুলটা হাতে আসুক।
তারপর লক্ষ্য রাখবো কখন রানী ঘুমে ঢলে পড়ে:
ফুল নিঙড়ে রস ঢালবো টিটানিয়া-র চোখে।
জেগে উঠে যাকেই দেখবে চোখে, হোক না সিংহ,
ভালুক কিম্বা, নেকড়ে অথবা ষাঁড়,
সব ব্যাপারে-নাক-গলানো বাঁদরও যদি হয়,
তারই প্রেমে অন্ধ হয়ে ছুটবে টিটানিয়া।
আমার কাছে আছে আবার অন্য শিকড় এক,
যার বসে কেটে যাবে মিথ্যা মায়াঘোর।
ঘোর ভাঙাবার আগে হাতিয়ে নেব বালক-ভৃত্যটাকে।
কে যেন আসছে? অদৃশ্য হয়ে শুনবো ওদের কথা।
[ডিমিট্রিয়াস-এর প্রবেশ; পশ্চাতে হেলেনা]

ডিমিট্রিয়াস। তোমায় ভালবাসি না, তাই পিছু পিছু আর এস না!
লাইস্যাণ্ডার কোথায়? কোথায় রূপসী হার্মিয়া?
একজনকে মেরে ফেলবো, অন্যজন আমায় মেরে গেল।
বলেছ আমায় এই বনে এসেছে দুই পলাতক,
পেছন পেছন ছুটে এসে প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত হলাম,
হার্মিয়া-র দেখা তো কই পেলাম না।
যাও, কেটে পড়ো, আমার ল্যাজ ধরে আর ঘুরো না!

হেলেনা। টানছো কেন বলো তুমি অমোঘ আকর্ষণে?
মন নিঙড়ে বার করছ কেন অশ্রুরাশি?
শখ ক'রে তো আসছি না তোমার পিছু পিছু;
ওগো নিঠুর টেনো না আর, তবেই আসব না'ক কভু।

ডিমিট্রিয়াস। আমি কি কোনো লোভ দেখিয়েছি? দিয়েছি আশা?
শাদা কথায় বলছি না আজ মাস কয়েক ধরে
তোমায় ভালবাসি না, বাসতে পারি না?

হেলেনা। সেইজন্যই আরো তোমায় বেশি ভালবাসি—।
আমি তোমার কুকুর ডিমিট্রিয়াস,
মারো আমায়, দাও গালাগাল, ফিরিয়ে দাও
বারে বারে তোমার দুয়ার থেকে, তবু এটুকু দাও অধিকার

তোমার সংগে সংগে থাকবো। তোমার প্রেমও চাইনা আমি,
শুধু তোমার অবজ্ঞাকে বুকে ক'রে রাখবো।

ডিমিট্রিয়াস। বেশি ঘাঁটিও না বলে দিলাম, রক্ত আমার গরম;
তোমায় দেখলে আমার বমি আসে, বুঝলে?

হেলেনা। আর তোমায় না দেখলে যে আমার জ্বর আসে।

ডিমিট্রিয়াস। কি জ্বালায় পড়লাম! দেখ! নারীর এমন নির্লজ্জতা মোটেই ভাল নয়!
শহর ছেড়ে বিজন বনে পরপুরুষের সংগ ধরেছ;
দেহখানাও তোমার মোটে ফেলনা নয়;
তার ওপরে রাত্রি গভীর; সতীত্ব বজায় রেখে
ফিরতে পারবে তো?

হেলেনা। সততা তোমারই দিয়েছে সাহস; নারীলোলুপ তুমি তো নও।
আর রাত্রি কোথায়? তোমার মুখই আলো আমার; তোমার চোখই সূর্য।
বিজনবন এ মোটেই নয়, জগৎশুদ্ধ লোক এখানে,
তুমিই যে জগৎ আমার; একলা আমি মোটেই নই।

ডিমিট্রিয়াস। আমি ভেগে পড়বো, লুকিয়ে পড়বো ঝোপের মধ্যে;
আর হিংস্র সব জন্তু এসে তোমায় কামড়ে দেবে।

হেলেনা। সবচেয়ে হিংস্র পশুও তোমার মতন হিংস্র নয়;
যেখানে পালাও সংগে যাবো; রূপকথাকে উল্টে দেব—
রাজকুমারী পক্ষীরাজে ছুটে যাবে রাজপুত্রের খোঁজে;
ব্যাংগমী যাবে ব্যাংগমার পিছে, বাঘকে খুঁজবে বাঘিনী।
জানি শুধু গোলোক ধাঁধায় ঘুরে মরা,
কারণ সাহস যার সে পালিয়ে বেড়ায়,
আর ভীরু নারী করে অনুসরণ—।

ডিমিট্রিয়াস। বক বক বক আর সহ্য হয় না, যেতে দাও আমায়।
পেছন পেছন তেড়ে যদি আসো আবার আমার দিকে,
বনের মধ্যে ধরে তোমায় খচরা কিছু করে ফেলতেও পারি।

হেলেনা। শহরে, মন্দিরে, উদ্যানে-মাঠে যে অপমান করেছ
তার বেশি আর কি করবে? ছি ছি, ডিমিট্রিয়াস,
কলংক দিয়েছ তুলে পুরো নারীজাতির মাথায়—
প্রেমের জন্যে যুদ্ধ করা—নয়তো এ নারীর কাজ;
পুরুষই তো চিরদিন প্রেম-নিবেদন করেছে।

[ডিমিট্রিয়াস-এর প্রস্থান]

ছাড়বো না তোমায়; তোমার কোলে মাথা রেখে
মরতে যদি পারি, জীবনের এই নরককুণ্ডে
স্বর্গের ফুল ফুটবে। [প্রস্থান]

ওবেরন। বিদায় সুন্দরী কন্যা! এ বন ছেড়ে বেরুবার আগে—ঘুরে যাবে চাকা!
ঐ বোকচন্দর এমন ঘোল খাবে যে কোমর বেঁধে
বিষম প্রেমে ছুটবে তো তোমার পিছে

তুমিই তখন পালাতে আর পথ পাবে না।

[পাক-এর প্রবেশ]

পেয়েছিস ফুল? স্বাগতম পর্যটক!

পাক্। এই যে ফুল।

ওবেরন। দে দেখি।

গহন বনে আছে জানি মর্মরের বেদী,
চারিপাশে হাজার হাজার হেনা ফুটে থাকে,
সেই সংগে পারিজাত আর টগর ঝাঁকে ঝাঁকে,
চন্দ্রাতপের মতন মাথায় লজ্জাবতীর স্তূপ,
তারও ফাঁকে হাসতে থাকে কৃষ্ণচূড়ার রূপ।

সেইখানেতে ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে থাকে পরীর রানী,
মৃদুস্বরে পরীর দল গান গেয়ে যায় ঘুমপাড়ানি।
কাছেই যাচ্ছে সাপের রঙীন খোলস গড়াগড়ি,
লুকিয়ে থাকতে পারে তাতে আস্ত একটি পরী।
ঐখানেতে টিটানিয়া-র চোখে দেব ফুলের রস,
কল্পনা তার হবে নানা কালো বিভীষিকার বশ।
আর তুই নে ছিঁড়ে ফুলের খানিক যারে ছুটে গভীর বনে,
দেখবি রে এক রূপবতী ছুটছে আকুল প্রাণপণে
এক পাজী ছোঁড়ার পেছনে। ঐ ছোঁড়ার চোখ ধুইয়ে আয়
ফুলের রসে: দেখিস যেন জেগে উঠে দেখতে পায়
ঐ রূপবতীর মুখ। আর সহজ উপায় চিনতে পারার
শহর-ঘেঁষা ফতোবাবুর পোশাক গায়ে ছোঁড়ার।
দেখেশুনে কাজটা করিস; ছোঁড়ার বড় বাড় বেড়েছে
হাবুডুবু খাওয়া ওকে মেয়েটাকে বড় ভুগিয়েছে।
কাকপক্ষী ডাকার আগে ফিরে আসবি আমার কাছে।

পাক্। চিন্তা নেই মহান্ রাজা, বান্দা লায়েক আছে। [দুইজনের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যের আর এক অংশ।

টিটানিয়া ও তাঁহার অনুচরীদের প্রবেশ

টিটানিয়া। গান গেয়ে আর হাতে হাত ধরে
নাচরে তোরা সবাই মিলে।
তারপর সব ছড়িয়ে পড়।
কেউ ছুটে যা শিউলি-কোরক সাফ করে রাখ্ পোকা মেরে,
কেউ বা কষে লড়াই ক'রে চামচিকে-র সাথে
কেড়ে আন ডানা তাদের, পোষাক হবে ক্ষুদে পরীদের;
কেউ বা তাড়া হুতোম-প্যাঁচা নইলে জ্বালায় রাতে,

অবাক হয়ে দেখে মোদের, ভাবে এরা কারা।
গান গেয়ে এবার ঘুম এনে দে আমার আঁখিপাতে,
তারপর যাস কাজে ; দে ঘুমোতে শান্তিতে।

গান

১ম পরী। জিভচেরা যত রঙীন সাপ,
ব্যাঙ্, পোকা যত মাটির প্রাণী
বন্ধ কর যত দৌড় ঝাঁপ লাফ
হেথায় ঘুমোয় পরীর রানী।

[সকলে]

ধান খেয়ে যা বুলবুলি
গলায় মধুর গান তুলি
ঘুম আয় রে, ঘুম আয়রে, ঘুম!
(যেন) ইন্দ্রজালের যাদুকরী
রানীর মন নেয় না কাড়ি,
রানীর কপালে টিপ দিয়ে যা,
পেটভরে তুই ধান খেয়ে যা,
গান গেয়ে নে বিদায়!
আয় রে, ঘুম আয়!

২য় পরী। যা এবার পালা সবাই ; পাড়া জুড়িয়েছে
একজন শুধু পাহারায় থাক দূরের ঐ গাছে।

[পরীদের প্রস্থান ; টিটানিয়া নিদ্রিতা। ওবেরনের প্রবেশ এবং টিটানিয়ার চোখে ফুলের রস লেপন]

ওবেরন। জেগেই যাকে দেখবে চোখে,
প্রেমের টানে বেঁধো তাকে :
জ্বলে মোরো তারই তরে,
হোকনা কেন বনের নেকড়ে :
ভালুক কিম্বা উদ্‌বেড়াল,
ঝাঁকড়াচুলো খেঁকশিয়াল,
তোমার চোখে সবাই যেন
আসে প্রেমিক বেশে,
জেগে উঠো যখন কোনো
বিশ্রী জন্তু আসে। [লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়া-র প্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। প্রিয়তমা হার্মিয়া, বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অবসন্ন তুমি ;
সত্যি কথা বলেই ফেলি, পথ হারিয়ে ফেলেছি।
এস, এইখানেই বিশ্রাম করি, যদি তোমার ভয় না করে ;
দিনের আলোর সান্তনায় আবার পথ খোঁজা যাবে।

হার্মিয়া। তাই হোক্, লাইস্যাণ্ডার, খুঁজে নাও ধরাশয্যা।
আমি এই ঢিবিতে মাথা রেখে শোবো।

লাইস্যাণ্ডার। একই উপাধানে মাথা রেখে শোবো আমরা দুজনে;
এক হৃদয়, এক শয্যা, দুই বুকে এক শপথ।
হার্মিয়া। না লাইস্যাণ্ডার, পায়ে পড়ি। যদি আমায় ভালবাসো,
তবে দূরে সরে শোও, এস না কাছে।
লাইস্যাণ্ডার। কেন বলো হার্মিয়া? আমার মনে পাপ নেই।
ভালবাসায় কলুষ নেই, ভালবেসেও তা বোঝোনি?
তোমার বুকে, আমার বুকে একই প্রতিজ্ঞা;
তবে এক শপথের বৃন্তে ফোটা দুটি হৃদয়-ফুল,
একই সংগে কাছাকাছি নিবিড় হয়ে থাকবে।
হার্মিয়া। কথায় তুমি বেজায় দড়, পারবার আর জো নেই।
না, না, কথায় তোমার করছি না সন্দেহ;
অমন ছোটলোক আমি নই। তবু, বন্ধু,
ভালবেসেও নারীর থাকে লাজলজ্জার বালাই;
তাই দূরে সরে শোও; যতদিন না বিয়ে হবে,
সেই লাজলজ্জার দোহাই, দূরে দূরে থেকো।
শুভরাত্রি; বন্ধু; যতদিন প্রাণ তোমার থাকবে,
ততদিন আমার 'পরে এই ভালবাসা যেন থাকে!
লাইস্যাণ্ডার। আমারো সেই প্রার্থনা, তথাস্তু।
তোমার বিশ্বাসের যদি অবমাননা করি,
তবে যেন আমার মৃত্যু হয়।
এইখানে শোবো আমি; ঘুমোও; হার্মিয়া, ঘুমিয়ে শান্তি পাও!
হার্মিয়া। ঘুমে তোমারও গলা জড়িয়ে এসেছে,
চোখে নেমেছে বিস্মৃতি। [দুইজনের নিদ্রা। পাক্‌এর প্রবেশ]

পাক্‌। খুঁজে মরলাম হেথায় হোথায়
ফতোবাবু গেলেন কোথায়?
হুকুম হয়েছে চোখের 'পরে
প্রেম-জাগানো ওষুধ রগড়ে
ফতোবাবুর মন ফেরাবো।
কিন্তু ভোঁ ভাঁ—চারিদিকে চুপচাপ রাত্রি!
এই যে বাবা, কে এখানে?
শহুরে পোশাক এর পরণে;
তাই তো মনিব বলে দিলেন,
ইনিই তো প্রেম পায়ে ঠেলেন।
আর ঐ তো মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে,
ভিজে কাদায় পড়ে আছে।
বেচারীকে ঠেলেছে দূরে,
এই হতভাগা খচ্চরে।
পাজীর চোখে দিলাম রস,

জেগে উঠে ক্যাবলা হোস,
প্রেমে পড়ে জবুথবু,
ইন্দ্রজালে হাবুডুবু।
চলি আমি, জাগিস এখন,
ডাকছে আমায় ওবেরন। [প্রস্থান। ডিমিট্রিয়াস ও হেলেনা-র বেগে প্রবেশ।

হেলেনা। দাঁড়াও, ডিমিট্রিয়াস, দাঁড়াও, আমায় মেরে ফেলো।

ডিমিট্রিয়াস। মলো যা! তবু আসে! এখনো পেছনে কেন?

হেলেনা। আঁধার রাতে আমায় ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি?

ডিমিট্রিয়াস। হ্যাঁ, যাচ্ছি, কাছা ধরে আবার এলে করে ফেলবো খুন-ই। [প্রস্থান

হেলেনা। উঃ বাবা, হাঁপ ধরেছে প্রেমের ঘুরপাকে,
যতই চাই, ততই ঘোরায় দড়ি দিয়ে নাকে।
সুখী হোলো হার্মিয়া! কোথায় তারা গেছে!
কি সুন্দর চোখদুটো তার, ডাকে যেন কাছে।
চোখে তার আলো কেন? নেই তাতে জল!
অশ্রু যদি আলো দিত, আমার চোখ তো ছলছল!
না, না, হিংস্র বনের পশুর মতন আমার ঘৃণ্য আঁখি,
আমায় দেখে পালায় তাই বনের পশু-পাখী।
তাই ডিমিট্রিয়াসও পালিয়ে যাবে আশ্চর্য আর কি?
রূপের গরব জাগিয়েছিল মিথ্যাবাদী আরশি,
দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম রূপের চেতনায়
হার্মিয়া-র সমান আমি আত্ম-এষণায়।
এ কে এখানে? ভূমির 'পরে শুয়ে আছে? লাইস্যান্ডার'
মৃত? না ঘুমন্ত? রক্ত তো নেই, সেই ক্ষতচিহ্ন!
লাইস্যান্ডার! বন্ধুবর! ওঠো জাগো!

লাইস্যান্ডার। [জাগিয়া] এবং দেব অগ্নিপরীক্ষা তোমারই তরে ওগো!
বক্ষদুয়ার ভেদ করে তোমার দেখছি হৃদয়-জ্বালা!
কোথায় ডিমিট্রিয়াস? কুৎসিৎ ঐ নামটি তার
ফেলবে মুছে ধরিত্রী থেকে এই তরবার ক্ষুরধার।
তোমার হার্মিয়াকে ভালবেসেছে, এই অপরাধে রাগ কোরো না,

হেলেনা। বোলো না, লাইস্যান্ডার, অমন করে বোলো না।
হার্মিয়া তো তোমায় ভালবাসে; তাতেই থাকো সুখী।

লাইস্যান্ডার। হার্মিয়াকে নিয়ে সুখী! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেখি?
ওকে নিয়ে পলে পলে দুঃসহ জীবন একি!
কাকের ডাক আর সইবে কে দোয়েল-শ্যামা-র পাশে?
সব কামনার ওপরে আছে বিচার বুদ্ধি—বিবেচনা;
সেই বুদ্ধি জানান দিচ্ছে—শ্রেষ্ঠ আমার হেলেনা!
লোকে বলবে, মঞ্জরিত না হতেই যৌবনের মুকুল
অন্ধ আমার প্রেম; বলছি আমি ভাঙুক দু-কূল,

আবেগস্রোতে ছাপিয়ে যাক সব মানুষের সংহিতা:
সজাগ আমার বুদ্ধি জানি; তুমিই আমার আকাংখিতা।
তোমার চোখের মন্দিরেতে আমার পথের অন্ত,
পড়বো নতুন গ্রন্থশ্লোক, অমর প্রেমের মন্ত্র।

হেলেনা। কি কুক্ষণে জন্ম আমার যে এমন পরিহাস করছ?
তোমার আমি কি করেছি যে এমন ব্যাংগ করছ?
ডিমিট্রিয়াসের ঘৃণার দৃষ্টি নয় কি চরম যন্ত্রণা?
তুমিও কেন তার ওপরে যোগ করছ গঞ্জনা?
অপমান! এ অপমান! বলছি তোমায়; এ অপমান!
তাচ্ছিল্যের এ পরিহাসে প্রেমের অপমান।
বিদাও দাও! ভেবেছিলাম তুমি বীরপুরুষ:
ভেবেছিলাম ভদ্র তুমি! স্বভাবে নেই কলুষ।
এখন দেখছি অসহায়া পরিত্যক্তা নারীর মান
তোমার কাছে খেলার জিনিস। দয়াহীন তোমার প্রাণ। [প্রস্থান]

লাইস্যাণ্ডার। হার্মিয়াকে দেখতে পায়নি! হার্মিয়া ঘুমোও কষে!
মরো না আর লাইস্যাণ্ডারের টিকি দেখার আশে!
গাদা গাদা মিষ্টি খেলে পেট গুলোয় শেষে,
মিষ্টি জিনিস দেখলেই তখন বমি-টমি আসে।
ভণ্ড গুরু ধরা পড়লে মানুষ ভীষণ রাগে,
সবচেয়ে চটে শিষ্যরা তার, তাদেরই বেশি লাগে।
তুমি মিষ্টির হাঁড়ি, আমার ধর্ম ভণ্ডবেশি,
সবাই তোমায় করবে ঘৃণা, আমি সবচেয়ে বেশি।
বীর্যে আমার শৌর্যে আমার জেগে উঠুক প্রেম-ই,
হেলেনা-কে জয় করবো, হবো তার স্বামী। [প্রস্থান]

হার্মিয়া। [জাগিয়া] লাইস্যাণ্ডার, বাঁচাও আমায়, এস তাড়াতাড়ি,
বুকে আমার হাঁটছে সাপ, সরাও একে টেনে।
উঃ, কি ভীষণ! দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম!
লাইস্যাণ্ডার, দেখ আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে।
দেখলাম এক সরীসৃপ খুঁড়ে খাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড
আর তুমি দেখে দেখে হাসছো! লাইস্যাণ্ডার!
কোথায় গেল? লাইস্যাণ্ডার! স্বামী!
শুনতে পাচ্ছ না? চলে গেছে? উত্তর নেই, কথাটি নেই?
কোথায় তুমি? যদি শুনতে পাও, জবাব দাও।
যদি ভালবাসো কথা কও! ভয়ে আমার চেতনা লোপ পাচ্ছে নাকি?
নেই? তাহলে সে নেই, কাছেপিঠে কোথাও নেই;
হয় তোমায় খুঁজে বার করবো, নয় আজ মরবো এখানে। [প্রস্থান]

অনুবাদ : উৎপল দত্ত আগামীবারে সমাপ্য।

বন্ধুসঙ্গ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ছেলে আর তার বন্ধুকে দেখেই সেদিন প্রণবেশের সংগক্ষুধাটা অমন উদগ্র হয়ে উঠেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনা তাঁর সেদিনের রুটিনকে বেশ খানিকটা উলটে পালটে দিয়ে গেল। অন্য দিনের মত আজও তাঁর দিনটি নির্দিষ্ট নিয়মেই শুরু হয়েছিল। ভোরে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে তিনি পার্কে গোটা তিনেক পাক দিয়ে এসেছিলেন। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের সংগে চা-টা খেয়ে ঘরে এসে এটা-ওটা বইপত্র উলটে পালটে দেখছিলেন। এই সময় তিনি একটু কবিতা পড়তে ভালোবাসেন। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। বহু-বার পাঠের পর কান আর মন যাতে অভ্যস্ত হয়েছে তার বাইরে বড় একটা যেতে চান না। সেই সঞ্চয়িতা, গীতাঞ্জলি কি গীতবিতান। গীতা কি উপনিষদের শ্লোক। পাছে বন্ধুরা একে তাঁর এক ধরনের ধর্মাচরণ বলে ঠাট্টা করেন তাই তিনি বলেন এই সব বইয়ের ধর্মতত্ত্ব কি দর্শনের আবেদন তাঁর কাছে বিশেষ কিছু নেই। নিছক কাব্যপ্রীতি থেকেই ধ্বনি মাধুর্যে তাঁর আসক্তির জন্যেই তিনি এসব কিছু কিছু পড়েন। তাঁর ভাবতে ভালো লাগে দিন যাত্রার শুরুতে একটু ছন্দ থাকুক, একটু অন্তঃশীল সঙ্গীতের ঝংকার লাগুক। বাড়ির আর সবাই খবরের কাগজের জন্যে এ সময় উদগ্রীব হয়ে থাকে। হকার একটু দেরি করে কাগজ দিলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঊষাকালে কাগজ দেয় না বলে সুনন্দা যে কতবার হকার পালটেছেন তার ঠিক নেই। কিন্তু প্রণবেশের মনে তথ্যের তৃষ্ণা অত প্রবল নয়। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে রাত পোহাবার সংগে সংগে কাকের মুখে সে বার্তা তার না পেলেও চলে। খানিকক্ষণ কাব্য দর্শনের স্বাদ নেওয়ার পর বেলা সাড়ে সাতটা আটটায় তিনি কাগজের খোঁজ করেন। কোনদিন বা দাড়ি কামাবার পর, কোনদিন বা দাড়ি কামাবার সংগে সংগে তিনি শিরোনামাগুলির ওপর চোখ বুলান। কোন খবর আকর্ষণযোগ্য হলে আরো ভিতরে নামেন। তখন কাগজের কোন শরিক থাকে না। স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবারই সে কাগজ মোটামুটি দেখা হয়ে যায়। প্রণবেশ উলটে পালটে কাগজ দেখে দাড়ি কামিয়ে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢোকেন। দশটায় অফিস। তার উদ্যোগ পর্ব আটটায় শুরু না করলে চলে না।

আজও আটটার কিছু আগে প্রণবেশ কাগজের খোঁজ করলেন। কিন্তু কাগজ নেই। সংসারের নিয়মই এই যা খুঁজবে তা পাবে না। একটু বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, -কাগজখানা আবার কী হল ?

সুনন্দা তখন নতুন রাঁধুনীকে নির্দেশ উপদেশ দিতে ব্যস্ত। বললেন,—কী জানি কী হল তোমার কাগজের। সব দিকে সব সময় আমি অত চোখ রাখতে পারিনে। সবই তোমাকে একেবারে হাতের ওপর এনে দিতে হবে এমন কি কথা আছে ? দেখ গিয়ে পানু বোধ হয় পড়ছে কাগজ।

প্রণবেশ যেন স্বগতোক্তি করলেন—এখনও যদি কাগজই পড়ে বই পড়বে কখন ?

প্রথমে ভাবলেন পানুকেই চীৎকার করে ডাকবেন প্রণবেশ। বলবেন,—কাগজটা এ ঘরে দিয়ে যাও।

কিন্তু চেঁচাতে ইচ্ছা হল না। করিডোর দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে নিজেই ছেলের

ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রণবেশ। তিন ঘরের ফ্ল্যাটের সবচেয়ে ছোট নিরিবিলি এই কোণের ঘরখানাই পানু নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে। ছেলের পড়াশুনোর সুবিধে হবে বলে প্রণবেশ ও ঘরখানা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু ছেলে আরো অনেক সুবিধেই খুঁজে নিয়েছে দেখা যাচ্ছে।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, কিন্তু জানলার দুটি পাটই খোলা। সেই জানলা দিয়ে সবই দেখলেন প্রণবেশ। ছেলে টেবিলের ধারে বসে খবরের কাগজও পড়ছে না, কলেজের পড়াও পড়ছে না; আর একটি ছেলের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে। দুজনের সামনে দুটি চায়ের কাপ, মুখে গল্প।

প্রণবেশ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তারপর মৃদু কিন্তু গম্ভীর স্বরে ডাকলেন,—পানু, কাগজখানা নিয়ে এঘরে একটু এসো।

সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন প্রণবেশ। কিন্তু নিজের চেয়ারখানায় এসে বসতে না বসতেই দেখলেন কাগজ হাতে পানু এসে হাজির হয়েছে।

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলেন প্রণবেশ কিন্তু ঠিক তখনই পানুকে ছুটি দিলেন না। একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, -ছেলেটি কে?

পানু বাবার দিকে চেয়ে অসঙ্কোচে বলল,—আমার বন্ধু।

বন্ধু কথাটা নিশ্চয়ই অশ্রাব্য নয় তবু কানদুটো লালচে হয়ে উঠল প্রণবেশের। তাঁদের সময়ে রীতিনীতি আলাদা ছিল। কলেজে তিনিও তো পড়েছেন। কিন্তু বাবার কাছে কি কাকার কাছে কাউকে সরাসরি এভাবে 'আমার বন্ধু' বলে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন নি। ঘুরিয়ে বলেছেন,—আমাদের সঙ্গে পড়ে।

ঠাকুরদা বলতেন, 'ইয়ার বন্ধু'। বন্ধুর সঙ্গে বয়স্যের যে সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সতের আঠের বছরের বি. এ. পঠনরত ছেলেকে পদে পদে আচরণ বিধি শেখাতেও যেন কেমন লাগে।

মনের উত্তাপকে ঠাণ্ডা হতে দিয়ে প্রণবেশ মুখে একটু হাসি টেনে বললেন,—তোমার বন্ধুরা কি অফুরন্ত? এর আগে তো ওকে দেখি নি।

এবার ছেলের মুখে রসের ছোপ লাগল। কিন্তু সে বেশ শান্তভাবেই জবাব দিল. —সরিৎ আমাদের কলেজই সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। ফিজিক্সে অনার্স। খুব ভালো ছেলে।

প্রণবেশ বললেন,—ভালো হলেই ভালো। তুমি নিজেতো সায়েন্স নিতে সাহস পেলে না। দু'একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় থাকা অবশ্য ভালোই। আচ্ছা যাও।

ছেলে চলে যেতে না যেতেই সুনন্দা এলেন তার পক্ষের উকিল হয়ে। স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,—আচ্ছা তুমি কী।

প্রণবেশ বললেন,—কঠিন এক দর্শনের প্রশ্ন করে বসলে। এক কথায় কী করে এর জবাব দিই। এই মুহূর্তে তো মনে হচ্ছে আমি কিছুই না।

সুনন্দা বললেন,—না ঠাট্টা নয়। ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব দেখলেই তুমি যেন কেমন করো। তোমার না হয় কেউ নেই, কাউকে তোমার দরকারও নেই। কিন্তু তাই বলে ওদের বন্ধুবান্ধব বাড়িতে আসবে না?

প্রণবেশ বললেন,—আসবে বই কি। কিন্তু সকালে আড্ডা দিতে আসা কি ভালো।

সুনন্দ বললেন,—বাঃ রে বন্ধু আসবে তার আবার সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্তির আছে নাকি? তাছাড়া পানুদের তো সামারের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। এখনো পড়ার চাপ তেমন পড়েনি। এলোই বা দুটি একটি ছেলে ওর কাছে। তবু তো এখনো ছেলে তার ছেলে বন্ধুদেরই নিয়ে আসে, মেয়ে আনে মেয়ে বন্ধুদের। আর একটু বড় হলে যখন উলটোটি হবে তখন তুমি সইবে কী করে তাই ভাবি।

প্রণবেশ বললেন,—তুমি সইতে পারলেই হল।

জানলার পাশ থেকে শীলা তাড়াতাড়ি সরে গেল। চতুর্দশী মেয়ের মুখে চাপা হাসি দেখতে পেলেন প্রণবেশ। মেয়ে এখনো ফ্রক পরে। মিশনারী স্কুলে সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্রী। কিন্তু সুনন্দা যে রকম দ্রুতবেগে ছেলের বান্ধবী আর মেয়ের সখী হয়ে উঠছে তাতে ওদের পেকে যেতে বেশি দেরি নেই। প্রণবেশ মনে মনে ভাবলেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না। বয়স হলে বাক সংযমই সবচেয়ে বড় সংযম- দাম্পত্য কলহ হ্রাসের সুপরীক্ষিত পথ।

ঘর নির্জন হলে তিনি ফের টেবিলের দিকে তাকালেন। স্ট্যান্ডে ঠাসা বই। কিন্তু আদ্যোপান্ত খুব কমই পড়া হয়েছে। একটি বিলিতি পাবলিশিং কনসার্নে বড় মেজো বাদ দিয়ে সেজোসাহেবের পদে কাজ করেন প্রণবেশ। সেই সূত্রে বইপত্র বিনামূল্যে কি স্বল্প-মূল্যে বগলদাবা করে নিয়ে আসেন বাড়িতে। কিন্তু বই যত আনেন পড়া তত হয়ে ওঠে না। জ্ঞানসিন্ধুই হোক আর রসসিন্ধুই হোক নতুন সমুদ্রে সাঁতরাবার শখ শক্তি অধ্যবসায় যেন ক্রমেই কমে আসছে। সেই পুরোন বই আর পুরোন বন্ধু। কিন্তু বন্ধু কোথায়! বন্ধু নেই। প্রণবেশ গভীর অভিমানে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এ বয়সে আর বন্ধু থাকে না।' প্রণবেশ হয়তো নিঃসহায় নয়, কিন্তু নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব।

এবার বইগুলির সামনে একটি ক্লিপে আঁটা খানকয়েক চিঠির দিকে তাকালেন প্রণবেশ। কোন চিঠিই অফিসের নয়। সবই তাঁর ব্যক্তিগত। আত্মীয়স্বজন প্রীতি-ভাজন স্নেহভাজনদের লেখা। কিছু চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছে কিছুর বা হয় নি। প্রথমেই মৃগাঙ্কের লেখা চিঠিখানা চোখে পড়ল। এ চিঠির জবাব দেবার দরকার নেই। তবু চিঠিখানা ওপরেই রয়েছে। কয়েকবার পড়া চিঠিখানা আরো একবার পড়লেন প্রণবেশ।

প্রণব,

তোমার চিঠি পেয়েছি। জবাব দিতে দেরি হল। কিছু মনে কোরো না। বড় ঝামেলায় ছিলাম। সপ্তাহ খানেকের ছুটি নিয়ে আমরা কাল কলকাতায় যাচ্ছি। উঠছি নিউ আলীপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে তোমাদের ওল্ড শ্যামবাজার বড়ই দূর। প্রায়ই এই পাটনা থেকে কলকাতার মত। তাছাড়া আমি জরুরী কাজের এক লম্বা ফর্দ নিয়ে যাচ্ছি। কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাতের ফুরসুৎ পাব না। যদি পারো ফোন কোরে একদিন চলে এসো। ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দুই-ই দিয়ে রাখলাম। ইতি—

মৃগাঙ্ক

প্রণবেশের বাড়িতে ফোন না থাকলেও অফিসে আছে। সেখান থেকে একদিন তিনি ফোনে খবরও নিয়েছিলেন মৃগাঙ্কের। ওকে অবশ্য পাননি। ওর স্ত্রীকেও না। কিন্তু তিনি যে ফোন করেছিলেন সে খবর নিশ্চয়ই মৃগাঙ্ক পেয়েছে। তবু সে একবার খোঁজ নেয়নি। খোঁজখবর নেবার পালা যেন শুধু প্রণবেশেরই। দেখা করবার জন্যে তিনিই বারবার ছুটবেন। জরুরী কাজ সংসারের ঝামেলা আজকাল কার না আছে? কিন্তু তাই

বলে বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর কি কেউ নেয় না! যে এড়াতে চায় তার অজুহাতের অভাব হয় না। তবু প্রণবেশ প্রায় রোজই আশা করেছেন মৃগাঙ্ক ফোন করবে, বলবে, 'আমি আছি তুমি এসো।'

নিউ আলিপুর থেকে শ্যামবাজার দূরের পথ হতে পারে কিন্তু এসপ্লানেডে যেখানে প্রণবেশের অফিস সেখানে তো মৃগাঙ্ক একবার ইচ্ছা করলেই আসতে পারত। কিন্তু হয় প্রণবেশের কথা মৃগাঙ্কের মনে নেই, না হয় ইচ্ছা করেই সে মনে আনেনি। সে দরকারী কাজে এসেছে অদরকারের বন্ধুত্বকে সে আমল দেবে কেন? এ সংসারে শুধু ভাবের সম্পর্কের কোন মূল্য নেই। স্বার্থের ওপর, প্রয়োজনের ওপর যে সম্পর্কের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নয় তা রঙীন বুদ্বুদের মত। বিশুদ্ধ সাহিত্য শিল্প থাকতে পারে কিন্তু বিশুদ্ধ সম্পর্ক শিল্প বলে কোন বস্তু অসম্ভব।

তারিখ মিলিয়ে দেখলেন প্রণবেশ। মৃগাঙ্ক কলকাতায় এসেছে আজ ছ'দিন। হয়তো আজই চলে যাবে। কি দু-একদিন হাতে রেখে যদি বলে থাকে কাল পরশুও যেতে পারে। একবার দেখবেন নাকি ঢু মেরে? পাঁচ মিনিটের বেশি থাকবেন না। শুধু একটিবার দেখে আসবেন, দেখা দিয়ে আসবেন। বলে আসবেন, 'তোমার যে কত টান তা দেখা গেল।'

ঘড়ি দেখলেন প্রণবেশ। আটটা বাজে। এবেলা নিউ আলিপুর গেলে আজ আর অফিস করা হয় না। একদিন ক্যাজুয়াল লীভ নিতে পারেন প্রণবেশ। ছুটি জমে আছে অনেক। আগের বছরে কটা দিন তো নষ্টই হয়ে গেল।

দাড়িটা তাড়াতাড়ি কামিয়ে নিলেন প্রণবেশ। আলমারি খুলে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি নিজেই বার করে নিলেন। ভেবেছিলেন স্ত্রীকে না বলেই পালাবেন, কিন্তু বেরোবার আগের মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়ে গেলেন।

সুনন্দা বললেন,—একী তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? প্রণবেশ চোরের মত কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললেন, -এই একটু ঘুরে টুরে আসি।

সুনন্দা চোখ বড় করে বললেন,—ঘুরে টুরে আসি মানে? অফিসে যাবে না?

প্রণবেশ বললেন,—না, ভাবলাম আজ আর যাব না। ওবেলা বরং তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যাব। অনেকদিন থিয়েটার সিনেমা কিছু দেখিনি।

সুনন্দা বললেন,—যাক আর ঘুষ দিয়ে দরকার নেই। তোমার সঙ্গে সিনেমায় আমি গেলে তো? অফিস কামাই করে কোথায় যাচ্ছ তাই বলতো?

কিন্তু স্ত্রীর কাছে নাম ফাঁস করতে সহজে রাজী হলেন না প্রণবেশ যেন কোন গোপন অবৈধ অভিসারে বেরোচ্ছেন। বললেন,—যাচ্ছি এক জায়গায়।

সুনন্দা বললেন,—তুমি না বললে কী হবে, আমি জানি কোথায় তুমি যাচ্ছ।

—কোথায়?

—নিশ্চয়ই মৃগাঙ্কবাবুর কাছে। কদিন ধরেই তো তাঁর নামে নালিশ চলছে। আমি তখনই বুঝেছি তুমি শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারবে না।

প্রণবেশ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন,—গেলামই বা। কোন মৃগনয়নার কাছে তো আর যাচ্ছি নে।

সুনন্দা বললেন,—পারলে কি ছেড়ে দিতে? কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু এসে অবধি একটা খবর দিলেন না। সেবার আমার অত বড় অসুখ গেল। ও'রা তো তখন কলকাতাতেই ছিলেন। কেউ একবার খোঁজখবর নেননি।

প্রণবেশ বললেন,—ছেড়ে দাও। সবাইর কাছ থেকে কি আর সব বস্তু পাওয়া যায়।

সুনন্দা বলতে লাগলেন,—বেশ যাচ্ছ যাও। তোমার বন্ধুর কাছে তুমি যাবে আমি কথা বলবার কে? কিন্তু আমার কোন আত্মীয়স্বজন যদি তোমার একটু অনাদর অযত্ন করে তোমার মুখখানা কেমন হাঁড়ি হয়ে যায় তাও আমি দেখেছি।

পাছে ফের স্ত্রীকে হাঁড়ি মুখ দেখাতে হয় তাই মুখখানা ফিরিয়ে নিয়েই প্রণবেশ কোনরকমে বেরিয়ে গেলেন।

রাস্তায় নেমে খানিকদূর এগিয়ে একটি রেডিয়ো স্টোর্সে গিয়ে ঢুকলেন প্রণবেশ। রেডিয়ো মেরামতের ব্যাপারে কয়েকবার আনাগোনা করতে হয়েছে। মালিক তাঁকে চেনেন। দোকানে ঢুকে প্রণবেশ বললেন,—একটি ফোন করব।

তিনি বললেন,—বেশ তো।

প্রণবেশ ভাবলেন, ফোন করে যাওয়াই ভালো। এতদূর থেকে যাবেন অথচ গিয়ে যদি দেখা না পান পণ্ডশ্রম হবে। মৃগাঙ্ক এখনো আছে কিনা কলকাতায় তাতো তিনি জানেন না। সত্যিই এসেছে কিনা তারই বা ঠিক কি।

বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে প্রণবেশ ফোন নাম্বারটা দেখে নিলেন। ফোনে নারীকণ্ঠে সাড়া পেলেন প্রণবেশ। নারীকণ্ঠ তবে মৃগাঙ্কের স্ত্রী ধরেনি। আর কেউ ধরেছেন। তাঁর কাছ থেকে খবর মিলল মৃগাঙ্ক কাল চলে যাচ্ছে। এখন অবশ্য বাড়িতে কেউ নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কোন্ এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে গেছে। তবে বেশি দূর যায়নি। বলে গেছে আধঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। কেউ এলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। প্রণবেশ জানিয়ে দিলেন তিনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবেন। মৃগাঙ্ক যেন দয়া করে সে সময় বাড়িতে থাকে।

কিন্তু ফোন করেই ভাবলেন,—কেন করলাম। কেন বললাম যে যাব। দেখাসাক্ষাৎ তো ও বন্ধ করে বসে নেই। শুধু প্রণবেশের সঙ্গে দেখা করবার বেলাতেই জরুরী কাজের দোহাই।

প্রণবেশ নিজেকে অবজ্ঞাত এমনকি অপমানিত মনে করলেন।

দোকানের মালিককে ফোন চার্জটা দিতেই তিনি জিভ কেটে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—আরে ছি ছি ছি। ওটা আপনি রেখে দিন। দয়া করে আসবেন মাঝে মাঝে। রেডিওটা চলছে তো বেশ?

মালিকের শিষ্টাচারে প্রণবেশ মুগ্ধ হলেন। সাধারণ একজন দোকানদার। তাঁরও যে সৌজন্যটুকু আছে প্রণবেশের তিরিশ বছরের পুরোন বন্ধুর সেটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। হ্যাঁ, মৃগাঙ্কের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বয়স তিরিশ বছরই হল। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব আজ আর কালজয়ী নয় কালজীর্ণ।

সারি সারি বাসগুলি অপেক্ষা করছে। অফিসের ভিড় এখনো শুরু হয়নি। একটু বাদেই হবে। কালো একটি ডবল-ডেকারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণবেশ এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন উঠবেন কি উঠবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেবারে দোতলায় উঠে গেলেন। লম্বা চওড়া ভারি চেহারা প্রণবেশের। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে। কিন্তু এখনো দোতলায় উঠবার উৎসাহ আছে। সামনের দিকে জানলার ধারে একটি সীট নিলেন। একটু পরিশ্রম হল অবশ্য। ভাবলেন এর মজুরী কি পোষাবে!

প্রণবেশকে দিয়ে মৃগাঙ্কের তো কোন প্রয়োজন নেই। প্রণবেশ নিজের আচরণের কথা ভেবে নিজেই একটু হাসলেন। নিজেকে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি কেন যাচ্ছি? আমি কি আমার ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি? ও যেমন গল্প করার জন্যে সকালেই একজন বন্ধুকে জুটিয়েছে আমারও কি তেমন একজন কথা বলবার লোক না হলে চলছিল না? কিন্তু সেই বাক বিনিময় তো পাড়ায় বসেও চলত। পরিচিত লোক আশেপাশে তো অনেকেই ছিল। এমনকি তাদের কাউকে কাউকে বন্ধু বলেও মনে করা যায়। আর আজকাল বন্ধুত্ব মানে তো তাই। যে কোন একজন লোকের সঙ্গে বসে চা খাওয়া আর খানিকক্ষণ গল্প করা। তার জন্যে বিশেষ করে মৃগাঙ্ক সেনকে কেন?'

তার সঙ্গে কলেজের সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে প্রায় তিরিশ বছরের আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব বলে? কিন্তু অঙ্কের হিসেবটাই কি সব? সম্পর্কের ঘনত্ব কি তার চেয়ে বড় নয়? সেই অন্তরঙ্গতা সব সময় বছর গুণে গুণে হয় না, বছরে বছরে বাড়ে না। বরং বছরে বছরে ক্ষয় পায়।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর প্রথম প্রণয়? কিন্তু প্রথম বলেই কি সবকিছু শেষ জীবন পর্যন্ত মূল্য পায়। জীবনে অমন কত হাজার হাজার প্রথমের আবির্ভাব আর তিরোভাব ঘটে তার কি কিছু ঠিক আছে? প্রথম যদি দীর্ঘতম না হয় তাহলে তার কী এমন মূল্য থাকে?

প্রণবেশ ভাবলেন দুজন পুরোন বন্ধু শারীরিক দিক থেকে বেঁচে থাকলেও তাঁদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বজায় থাকলেও বন্ধুত্ব অনেক আগেই অদৃশ্য হয় এমন তো যথেষ্টই দেখা যায়। তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে আর শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় না..? নামে যে অক্সিজেন আছে তার জোরেই তা বাঁচে।

বাসটা এসপ্লানেড ছাড়াল। মাঠের হাওয়া লাগল গায়ে। গাছপালার সবুজ দৃশ্য চোখে পড়ল প্রণবেশের। মন্দ লাগল না। অন্য দিন এই সময় কি এর একটু পরে অফিসে গিয়ে ঢোকেন। সারাদিন কাজের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। আজ তার ব্যতিক্রম। মৃগাঙ্কের কল্যাণে আজ তিনি একটি অপ্রত্যাশিত ছুটি পেলেন। ফোনের খবর পেয়েও মৃগাঙ্ক থাকবে কিনা কে জানে। হয়তো ফের একটা জরুরী কাজের অজুহাতে বেরিয়ে যাবে। যদি যায়, যদি দেখা না হয় প্রণবেশের কোন ক্ষোভ নেই। এই উপলক্ষে তাঁর একটু বেড়িয়ে আসা তো হবে। তা ছাড়া ও পাড়ায় পরিচিত লোকের একেবারেই যে অভাব তাতো নয়। কোথাও না কোথাও গেলেই হবে। এমন কি কোন একটি অপরিচিত দোকানে চা খেয়ে ফিরতি বাসে চলে আসতেও মন্দ লাগবে না। মাঝে মাঝে এমন অর্থহীন নিরুদ্দেশ নিঃসঙ্গ ভ্রমণ শরীর মনের পক্ষে ভালো।

মৃগাঙ্ক চিরকালই ওই রকম। কাজের চেয়ে কাজের ব্যস্ততা ওর বেশি। সময় যেন ওর একেবারে মিনিটে সেকেণ্ডে গোণা। আসলে তা নয়। অনেক সময় ওরও অপচয় হয়। কিন্তু প্রণবেশের কাছে তার আসবার সময় নেই, চিঠি লেখার সময় নেই। আর প্রণবেশের বাড়ি সব সময়ই তার কাছে দূরের পাল্লা। আসলে এ দূরত্ব ভূগোলের নয়, মনের। আজই না হয় মৃগাঙ্ক পাটনায় গেছে, অল্পদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে কিন্তু যখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ক্যালকাটা স্টেশনে ওর চাকরি ছিল কখনো ভবানীপুরে, কখনো কালীঘাটে কি চেতলায় ও বাসা করে বাস করেছে তখনো বছরে কদিনই বা মৃগাঙ্ক প্রণবেশের খোঁজ খবর নিত? সেই সময়ের অভাব, কাজের চাপ, শরীর খারাপের অজুহাত লেগেই থাকত।

প্রণবেশই বরং ফোনে খবর নিতেন, সময় পেলেই দেখা সাক্ষাৎ করতেন। করতেন বটে কিন্তু প্রতিবারই মনে হত এই একতরফা প্রতিদানহীন ভালোবাসায় কোন লাভ নেই। এতে মন সমৃদ্ধ হয় না। বরং পীড়িত হয়। মনের অস্বাস্থ্য অশান্তি বাড়ে।

প্রণবেশই বা এত অবুঝ কেন? হৃদয় নিয়ে তাঁরই বা এত কাঙালপণা? এত দাবি তিনিই বা ওর কাছে করতে যান কেন? কী করে তিনি এমন নিঃসংশয় হলেন যে বন্ধুত্ব এক সময় তাঁদের মধ্যে হয়েছিল তা এখনো বেঁচে আছে? মরা ঘোড়া দৌড়োয় না বলে তাঁর কেন এই অবুঝ হাহাকার?

অবশ্য দৃশ্যত কোন অঘটন ঘটেনি। তাঁরা ঝগড়া করেননি, মামলা-মোকদ্দমা করেননি। কেউ কারো গুরুতর রকমের স্বার্থহানিও করেননি। তা যেমন করেননি তেমন কেউ কারো জন্যে বড় রকমের কোন স্বার্থত্যাগ করেছেন, বৈষয়িক অবৈষয়িক কেউ কারো মহৎ কোন উপকার করেছেন এমন দৃষ্টান্তও এই তিরিশ বছরের ইতিহাসে নেই। এই তিরিশ বছর শুধু দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা আর তর্ক বিতর্কের যোগফল। আর দুটি পরিবার একই শহরে তখন বাস করত বলে দুই বউয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয়, দিন কয়েকের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ—সামাজিক রীতিরক্ষা। আবেগের সম্পর্ক দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠেনি যদি বা তার সূত্রপাত হয়েছিল তাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি ফলে যা হবার হয়েছে। এক বিন্দু জলে অনন্ত সুধা মিটাবার চেষ্টা করলে যে অসম্ভব দাবি করা হয় সেই দাবি মৃগাঙ্কের কাছে করে চলেছেন প্রণবেশ। তা মিটবে কেন?

রসা রোডের মোড়ে বাস বদলাতে হল। দ্বিতীয় বাসে একেবারে নিউ আলিপুরের মধ্যে গিয়ে নামলেন প্রণবেশ। জ্যামিতিক যান্ত্রিক শহর। কেউ কারো কোন খবর রাখে না। দু-তিনটি যুবকের কাছে বাড়ির নিশানা জিজ্ঞেস করে প্রতিবারই হতাশ হলেন প্রণবেশ। কেউ জানে না কেউ বলতে পারে না। উপযুক্ত জায়গাতেই এসে মাথা গুঁজেছে মৃগাঙ্ক।

শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে প্রণবেশই ওর আস্তানা বার করলেন। একটি দোতলা নতুন বাড়ির কড়া নাড়তেই একটি বারো তের বছরের ছেলে এসে দোর খুলে দাঁড়াল। না, মৃগাঙ্কের ছেলে নয়, তাকে তিনি চেনেন।

—কাকে খুঁজছেন?

—মৃগাঙ্ক আছে?

—হ্যাঁ, ওপরে বিশ্রাম করছেন। একটু আগে লেক মার্কেটে গিয়েছিলেন। আরো অনেক জায়গায় ঘুরেছেন।

প্রণবেশ মনে মনে বললেন,—তাতো ঘুরবেনই।

তারপর ছেলেটিকে একটু রূঢ়স্বরে বললেন,—বল গিয়ে প্রণবেশ দত্ত এসেছেন।

ছেলেটি বলল,—আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

সোফা সেটে সাজানো ছোট একটি ড্রয়িং রুম। জানলায় জানলায় নীল পর্দা। বেশ নিরিবিলি জায়গা। কোথাও যেন কোন সাড়াশব্দ নেই।

একটু বাদে গেঞ্জি-গায়ে একজন ভদ্রলোক নেমে এলেন। লম্বা ছিপছিপে। ফর্সা রঙ, সুদর্শন চেহারা।

প্রণবেশকে দেখে হেসে বললেন,—আরে এই যে প্রণব। আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সামনের চেয়ারটায় বসলেন মৃগাঙ্কমোহন।

প্রণবেশ বললেন—শুধু কি ভাবছিলে? ভেবে ভেবে দিনরাত ঘুমও হচ্ছিল না এ কথাও বলো।

মৃগাঙ্গ বললেন,—ঈস তুমি যে দারুণ চটে আছ। আমার ওপর তুমি কবেই বা না চটা। তুমি চটেই আস, চটেই চলে যাও।

প্রণবেশ বললেন,—আর চটবার তুমি কোন কারণই ঘটতে দাও না। তুমি এসে একবার খোঁজও নিলে না, একটা ফোন পর্যন্ত করলে না। অথচ হাতের কাছেই তোমার ফোন ছিল।

মৃগাঙ্ক বললেন,—থাকলে কী হবে। মনটা তো আর হাতের কাছে ছিল না। শুধু কি হাত দিয়ে কোন কাজ হয়? এতদিন যে কী ছুটোছুটির মধ্যে ছিলাম তুমি তা ভাবতে পারবে না। এসেছি চাকরির ব্যাপারে। আবার বদলি বদলি রব উঠেছে। কোত্থেকে কোথায় ঠেলবে তার ঠিক কী। তাই চেষ্টা চরিত্র করছি আবার যাতে কালী কলকাত্তা-ওয়ালীর কোলে ফিরে আসতে পারি। কর্মকর্তা অবশ্য দিল্লী। তবু এখানেও দু-একজন মুরুব্বি-টুরুব্বি আছে। সেই সব সিঁড়ি ধরে ধরে ওপরে উঠতে হয়। এই নিয়েই কদিন কাটল।

প্রণবেশ বললেন,—হুঁ।

মৃগাঙ্ক হেসে বললেন,—হুঁ! বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি তো এক জায়গায় বসে সারা-জীবন চাকরি করে গেলে। বদলির চাকরির যে কী সুখ তাতো আর তোমাকে টের পেতে হল না! প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম মন্দ নয়। এই উপলক্ষে নিখরচায় বেশ একটু দেশটা ঘুরে ফিরে দেখা যাবে। এখন একেবারে চোদ্দ ভুবন দেখছি। আর বোলো না। অসুবিধার চূড়ান্ত। ছেলেমেয়েগুলির পড়াশুনোর যে কী ক্ষতি হচ্ছে তা আর বলবার নয়। একেক জায়গায় একেক মিডিয়াম। কাছাকাছি ভালো স্কুল পাওয়া যায় না। তারপর গিন্নির প্যানপ্যানানি লেগেই আছে। সব জায়গায় তার স্বাস্থ্য টেঁকে না। বাড়ি যদি বা পাওয়া গেল এটা পছন্দ তো ওটা পছন্দ নয়। আমি বলি পৃথিবীর সব জায়গায় আমার একখানা করে শ্বশুর-বাড়ি থাকলে ভালো হত। কিন্তু তা যখন নেই—।

প্রণবেশ মনে মনে ভাবলেন একেবারে পারিবারিক মানুষ হয়ে গেছে মৃগাঙ্ক। যাকে বলে পরিবার পরিবৃত। পরিবারের বাইরে আর কোন জগৎ নেই। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করলে এমনই হয়।

মৃগাঙ্ক বললেন,—হাসছ যে!

প্রণবেশ বললেন,—এমনিই। তারপর তোমার স্ত্রীর শরীর এখন কেমন আছে। ইন্দিরা দেবীর দর্শন কি এখন পাওয়া যাবে?

মৃগাঙ্ক বললেন,—যদি ভক্ত হও পাবে বই কি। বাথরুমে ঢুকেছে দেখে এলাম। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তা তোমার তো কোন কাজ নেই। রাত পোহালে তোমাকে তো আর বোঁচকা নিয়ে পাটনায় ছুটতে হবে না। ভালো কথা, তোমার অফিস বুঝি আজ ছুটি? এ সময় এলে কী করে?

প্রণবেশ বললেন,—কামাই করে এসেছি।

মৃগাঙ্ক বললেন,—বল কি? আমার জন্যে একেবারে কামাই করে ফেললে? বন্ধু প্রেমের জ্বলজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত তুমি একটা দেখালে বটে। তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। অন্তত কয়েক ঘণ্টা নিশ্চিন্তে দিব্যি আড্ডা দেওয়া যাবে। আমি এবেলা আর বেরোব না।

কেনাকাটা প্রায় সবই সেরেছি। শ্বশুরকুলের কাছাকাছি যেখানে যিনি আছেন তাঁদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ প্রায় শেষ। জানো সদাশয় এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুর গাড়িখানা পেয়েছিলাম। তাই কাজকর্ম সেরে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম। এসে শুনলাম তুমি ফোন করেছ, তুমি আসছ। ভাবলাম যাক দেখাটা তাহলে হল।

প্রণবেশ মুখ ভার করে বললেন,—হ্যাঁ, আমি এলাম, তাই দেখা করার গরজটা তো কেবল আমারই।

মৃগাঙ্ক বললেন,—ব্যাপারটা অমন একপেশে করে দেখছ কেন। তুমি এলে এও যেমন একটা মহৎ ঘটনা, আমি তোমাকে পেলাম সেও তেমনি এক তাৎপর্যময় সংঘটন।

প্রণবেশ বললেন,—মৃগাঙ্ক, তোমার ওসব কথার কায়দা রাখো। তুমি চিরকাল কথার ভোজবাজি কি তুবড়িবাজি ছুটিয়েই সব মাৎ করতে চাইলে। তাতে সব সময় মাৎ হয় না। আমি আসতে আসতে কী ভাবছিলাম জানো? আমাদের যা ছিল তা আর নেই।

সেই সুদর্শন ছেলেটি এতক্ষণে দু' কাপ চা নিয়ে এল।

মৃগাঙ্ক বললেন,—আরে শুধু চা কেন। মিষ্টিটিষ্টি কিছু নিয়ে আয়। প্রণব এতদিন পরে এল।

প্রণবেশ বাধা দিয়ে বললেন—থাক থাক মিষ্টির আর দরকার নেই।

মৃগাঙ্ক বললেন,—একটু দরকার বোধহয় ছিল। তুমি তো একেবারে চিরতার জল মুখে করে চলে এসেছ। কিন্তু ভাই এখানে কাছাকাছি কোন দোকানপাট নেই। সেইটাই হল মহাঅসুবিধে।

প্রণবেশ বললেন,—যাক যাক, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। ফর্ম্যালিটির কোন দরকার নেই।

মৃগাঙ্ক চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,—কিন্তু তুমি তো ফর্ম্যালিটিরই ভক্ত।

প্রণবেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন,—মোটেই নয়। মনে কোন আবেগ থাকলে প্রীতি প্রেম বলে সত্যিকারের কোন বস্তু থাকলে তা আপনিই বেরিয়ে আসে। সেটা হল ফর্ম, রূপ, প্রকাশ। কিছু না থাকলে তার কোন বালাই থাকে না।

মৃগাঙ্ক বললেন,—বাঃ চমৎকার বলেছ। একটু আগে তুমি যেন আরো কী বলছিলে। আমি মরে ভূত হয়ে গেছি। তাই না?

প্রণবেশ বললেন,—তুমি ভূত হবে কেন। তোমার আমার মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল সেটা ভূত হয়েছে।

মৃগাঙ্ক বললেন,—তোমার দেখবার ভুল। ভূত হয়নি, সেটা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। দেখ, সব কিছুরই একটা পরিবর্তন আছে। সেই পরিবর্তনকে না মানলে চলে না। জীবনের হাজার প্রয়োজনের কাছে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়।

প্রণবেশ বললেন,—পরিবর্তন তো আছেই। আমিও তো সেই কথা বলি। জীবের যেমন কৌমার, যৌবনং জরা জৈব সম্পর্কেরও তেমনি। আর জরার পরে মৃত্যু।

দুই বন্ধুর মধ্যে মহাতর্ক জমে উঠল। শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে সেই তর্কে ছেদ পড়ল।

স্নান সেরে মৃগাঙ্কের স্ত্রী ইন্দিরা এসে সামনে দাঁড়ালেন। সুঠাম সুশ্রী চেহারা। মুখে মিষ্টি হাসি। প্রণবেশের মনে পড়ল আগে দু-একখানা চিঠিপত্র ইন্দিরা লিখত। এখন আর সে সব নেই। সুনন্দার সঙ্গে মৃগাঙ্কের সেই মধুর সৌখ্যও অবসান প্রায়। এই নিয়ম।

সর্বে ক্ষয়ন্তা নিচয়াঃ।

—ভালো আছেন। সুনন্দাদি আছেন কেমন। ইন্দিরা জিজ্ঞেস করলেন।

প্রণবেশ বললেন,—এলাম বলেই তো এত খোঁজখবর। দেখাসাক্ষাতের তো নামও নেই।

ইন্দিরা বললেন, —বাঃ-রে আপনারাই তো আসবেন। আমরা এলাম বিদেশ থেকে। যাবেন একবার পাটনায়। সত্যি ভেবেছিলাম সুনন্দাদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসব। কিন্তু ঝামেলার পর ঝামেলা। তারপর ছোট ছেলেটার আবার ক'দিন সর্দি জ্বর গেল।

মৃগাঙ্ক মৃদু ধমকের সুরে বললেন,—থাক থাক। তোমার কৈফিয়ৎ একবিন্দুও প্রণবেশ বিশ্বাস করবে না। তাতে ওর মনও ভরবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো। যাতে পেট কিছুটা ভরে তার একটা ব্যবস্থা কোরো। চিঁড়ে হোক, মুড়ি হোক, রুটি হোক, পাঁউরুটি হোক—

ইন্দিরা হেসে ভিতরে চলে গেলেন।

দুই বন্ধুর মধ্যে আবার তর্ক আর আলোচনা জমে উঠল। প্রণবেশও নিজের খুঁটি ছাড়েন না, মৃগাঙ্কও তাঁর নিজের কোট ছাড়তে রাজী নন। বন্ধুত্ব. প্রেম, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, ফাঁকে ফাঁকে দুজনেরই নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁরা না তুললেন। এমন জগাখিচুড়ি শুধু দীর্ঘকালের পরিচয়ের পটভূমিকাতেই পাকানো যায়।

পাঁচ মিনিটের কথা ভেবে এসেছিলেন প্রণবেশ। সেখানে আড়াই ঘণ্টা কাটল। দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্যে ঈষৎ পীড়াপীড়ি করলেন মৃগাঙ্ক আর তাঁর স্ত্রী।

কিন্তু প্রণবেশ বললেন,—তাতে লাভ কী। এখানে ভাতে টানাটানি পড়বে, আর সেখানে ভাত ফেলা যাবে।

মৃগাঙ্ক বললেন,—তাই তো। তাছাড়া তোমার পারিবারিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটানো অন্যায় হবে। এই বয়সে স্ত্রীর তুল্য বন্ধু নেই। সে কথা সবাইকে মানতে হয়। সব দরগায় সিন্নি দিয়ে দিয়ে যে ক্ষুদকুঁড়োটুকু থাকে সেইটুকু আমরা আজকাল একজন আর একজনকে দিতে পারি। তার বেশি দেওয়ার জো নেই। বুঝেছ প্রণবেশ?

মৃগাঙ্ক তাঁকে বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। প্রথম বাসটায় কিছুতেই উঠতে দিলেন না। হাত ধরে টেনে রেখে বললেন,—আরে যেয়ো যেয়ো। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। এর পরের বাসটায় ভিড় কম হবে।

ফলে আরো পনেরো মিনিট দেরি হল। আরো কিছুক্ষণ বাকবিনিময়। কখনো বা একটু নির্বাক হয়ে থাকা।

পরের বাসটায় উঠে বসলেন প্রণবেশ। জানলার ধার ঘেঁষে বসলেন। বাস ছেড়ে দেওয়ার সময় মৃগাঙ্কের দিকে হাসি মুখে তাকালেন। হাত উঁচু করলেন। স্মিত মুখ দেখলেন, উঁচু হাত দেখলেন।

বাস ছুটে চলল।

প্রণবেশ নিজের মনেই বললেন, 'এও বন্ধুত্ব'।

আধুনিক সাহিত্য

এককালে ক্রিটিক কথাটির মানে ছিল ত্রুটিনির্ণয়কারী, গ্রন্থকারের দোষ ধরা ছিল ক্রিটিকের মুখ্য কাজ। সমালোচনা কর্মের এই বৈশিষ্ট্য আজো লোপ পায়নি, বিশেষত 'রিভিউ' শ্রেণীর সমালোচনার, অতএব সাহিত্য আকাদেমির তরফ থেকে প্রস্তুত "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১--১৯৬১" নামক গ্রন্থখানা যদিও অনুরূপ বহু গ্রন্থের তুলনায় বৃহৎকায়, সুদর্শন এবং দেশী ও বিদেশী অনেক নামী লেখকদের রচনায় অলংকৃত এবং (আমার বিবেচনায়) এ-গ্রন্থে প্রকাশিত অন্তত দশ-বারোটি প্রবন্ধ রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার আসরে অবশ্য আসন পাবে, তবুও এমন বলতে পারি না যে খ্যাতিমান সম্পাদকদের নামশোভিত, সরকারী অর্থানুকূল্যপুষ্ট এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে যতটা আশা করেছিলাম তার সবখানি পূর্ণ হয়েছে। এ-গ্রন্থের একাধিক চন্দ্রকলঙ্ক লক্ষ্য করে মনে হচ্ছে আমাদের দেশে নিখুঁত বই (কোয়ালিটেটিভ্ অর্থে নিখুঁত ভাবছি না, পরিকল্পনা ও বহিরঙ্গের কথাই বলছি) প্রস্তুত করা কি অসম্ভব? অথবা ব্যবসায়ের প্রাইভেট সেক্টরের সিদ্ধিতে যে ত্রুটিহীনতা সম্ভব (যেমন সিগনেট প্রেস প্রকাশিত অনেক গ্রন্থে) পাব্লিক্ সেক্টরে (সাহিত্য আকাদেমিকে আমি প্রচ্ছন্ন পাব্লিক্ সেক্টের বলেই ধরছি) তা কি অসাধ্য? আলোচ্য গ্রন্থটি সুদর্শন কিন্তু মুদ্রণকার্য নিখুঁত নয়। ভাঙা অস্পষ্ট টাইপ প্রচুর। ছাপায় wrong fount ব্যবহৃত হয়েছে (যথা ১৩২ পৃঃ, struggle); একই শব্দের অক্ষর-পরম্পরার মাঝখানে ফাঁক থেকে গেছে (যথা ১৬০ পৃঃ, gone); কয়েকটি ছাপার ভুলও আমার নজরে পড়েছে—

১০২ পৃঃ—hypotheis, হওয়া উচিত hypothesis।

২৭২ পৃঃ পাদটীকা—Oberammergan, হওয়া উচিত Oberammergau।

৩৪৮ পৃঃ—Noble prize।

১৪৩ পৃঃ—shuffle off the artistic oil (আরেকটু হলেই দিব্যি Spoonerism হয়ে উঠতে পারত!)

৬২২ পৃঃ--Rabindranath, Tagore Pioneer, কমা-চিহ্ন প্রয়োগে ভুল হয়েছে।

৫২৬ পৃঃ--literatucr, হওয়া উচিত litterateur।

৫২৭ পৃঃ—Robert Frost. . . was dorn, হওয়া উচিত was born।

অন্তত তিনটি ভুল ইংরেজি দেখেছি। গ্রন্থের পরিকল্পনাও যেন খুব সজাগমনস্ক নয়। শেষ অংশে Offerings নামে অভিহিত ছয়টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে : Some Ethical Concepts for the Modern World (W. Norman Brown); The Implications of Indian Ethics for International Relations (Amiya Chakravarty); 'Early Sinological Studies at Santiniketan (Vasudev Gokhale); 'The One' in the Rig Veda (Stella Kramrisch); The Music of India (Narayana Menon); Indological Studies in India (Venkataraman Raghavan)। এসব প্রবন্ধের কোনো কোনোটি অল্পবিস্তর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু একমাত্র বাসুদেব গোখলের ছোট যে-নিবন্ধটিতে পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চৈনিক বিদ্যাভ্যাসের সামান্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটি ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলির প্রাসঙ্গিকতা আমার আদৌ বোধগম্য হল না। আলোচ্য গ্রন্থখানি যদি জার্মান অর্থে Festschrift হ'ত তাহ'লে এসব প্রবন্ধের গুটিদুয়েক এ-গ্রন্থে স্থান পেতে পারত, স্টেলা ক্রাম্‌রিশের ও নর্মান ব্রাউনের। অন্যগুলির উপযুক্ত আসর দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সংস্করণে। এই অংশের কোনো কোনো লেখকের ঔচিত্যবোধহীনতা পীড়াদায়ক। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত গ্রন্থে কোনোক্রমে এ'দের কেউ কেউ যদি বা (হয়তো আপন অজ্ঞাতসারেই) 'রবীন্দ্রনাথ' অথবা 'বিশ্বভারতী' এই দুই নাম উচ্চারণ করেই ফেলেছেন, শ্রীনারায়ণ মেনন সেটুকু ভুলও করেননি, ভারতীয় সংগীত বিষয়ে (বিশেষত সে-সংগীতের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে) লিখতে গিয়ে একটিবার রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেননি বরং প্রবন্ধটির শেষভাগে যেখানে সংগীত-অধ্যয়ন প্রচলিত হয়েছে এমন আটটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করতে গিয়ে Many universities, notably Madras, . . . Santiniketan লিখে প্রমাণ করেছেন যে তিনি এইটুকুও জানেন না যে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম শান্তিনিকেতন নয়, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন সেই পল্লীর নাম যেখানে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত।

অনুমান হয় সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করেছিলেন অমুক অমুককে অনুরোধ জানানো হবে প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধগুলি যখন পেঁছিল, সেগুলিকে আদৌ edit না ক'রে ছাপাখানার পাঠাবার কালে কিঞ্চিৎ সমস্যা জাগল যে এই ছয়টি রচনাকে পূর্ব-পরিকল্পিত শ্রেণীতে পর্যায়িত করা যাচ্ছে না, এগুলির কী হবে? কারুর উজ্জ্বল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে Offerings এই চমৎকার অনির্দিষ্ট নামটির উদয় হওয়াতে মুসকিলের আসান হ'ল। এই গ্রন্থের এক জায়গায় (পৃঃ ১০৪) বুদ্ধদেব বসু কিঞ্চিৎ ক্ষোভবিদ্ধ শ্লেষের সঙ্গে যথার্থ বলেছেন, Tagore has been elevated, or shall we say *reduced,* to an institution : he is an idol, a symbol of pan-Indian glory, a perennial prop for our national self-respect ; সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে প্রতিষ্ঠানীভূত যে-ক্ষীণপ্রাণতায় আজ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি পেঁছেছে তার কিছু নিদর্শন পেলাম এ-গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর স্তিমিতমনস্কতায়।

২

যে সব প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সমালোচনার অন্তর্গত হবে বলে আমার মনে হয়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক তারকনাথ সেনের Western Influence on the Poetry of Tagore। এই প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করেই আমি কয়েকটি কথা বলব। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলছি একাধিক কারণে। রবীন্দ্র-প্রতিভার যে-সব দিক এ-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তার কোনোটাই নূতন নয় বরং কোনো কোনোটি ইতিপূর্বে ভালোভাবেই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে ইওরোপীয় সাহিত্যদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা, হয়ে থাকলে সে-প্রভাবের স্বরূপ কী, তার মূল্য কতটুকু এসব বিষয়ে কোনো তথ্যনিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ আলোচনা অধ্যাপক সেনের পূর্বে কেউ করেননি, যদিও শিথিল আপ্তবাক্য অনেক শোনা গেছে। আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য পশ্চিমী কাব্যের উপরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সে-বিষয়ে আলোচনা কোথাও বড়ো একটা দেখিনি। আলোচ্য গ্রন্থে পিয়ের ফাল' মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ আছে, Tagore in the West, তাতে অবশ্য যে-বিষয়ে আমি

কৌতূহলী সে-বিষয়ে আলোচনা করার অবকাশ নেই। বরং Leos Janacek and Rabindranath Tagore এবং Tagore and Jimenez: poetic coincidences প্রবন্ধ দুইটিতে কিছু মূল্যবান তুলনা ও আত্মিক সংযোগের আভাস দেওয়া হয়েছে। স্মরণ হয় কিছুকাল আগে "বিশ্বভারতী পত্রিকায়" নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ—এই দুই জন কবির সংযোগ সম্বন্ধে স-প্রমাণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। অধ্যাপক সেনের বহু তথ্য ও পাদটীকা-সম্বলিত প্রবন্ধে সারি সারি নিষ্কম্প যুক্তির অরোধ্য অভিযানে প্রমাণিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপরে পশ্চিমী প্রভাবের কাহিনী প্রায়ই কপোলকল্পিত মাত্র। যে 'প্রমাণে'র ভিত্তিতে পশ্চিমী প্রভাব আরোপিত হয়, সে-প্রমাণ ধূসর সাদৃশ্য মাত্র, সাদৃশ্য প্রমাণ নয়। অধ্যাপক সেন এ-প্রসঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকোক্ত ফ্লুয়েলেনের চমৎকার (অ-)ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তির উল্লেখ করেছেন। আমার মনে পড়ে বহু বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কোনো এক বার্ষিক অধিবেশনে এক সৌম্য বৃদ্ধের রচিত একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধপাঠ শুনেছিলাম যার প্রতিপাদ্য ছিল এই কথাটা যে ইবসেন, বিয়র্ণসেন, আমুন্ডসেন ইত্যাদি নামের প্রমাণে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে বল্লাল সেনের সন্ততিগণ নরোয়ে দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রমাণ ও অপ্রমাণের প্রভেদ যে অনেক সমালোচক জানেন না তার এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে। লেখক গোড়ার দিকে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের কয়েক বৎসর আগে ১৮৫৭ সালে বোদ্‌লেয়রের "ফ্লর্ দ্যু মাল্" প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'যুক্তি'র দ্বিতীয় ধাপে তিনি বলছেন, 'বিলাতবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ যে এই কবির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না।' যুক্তির তৃতীয় এবং চরম ধাপে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথের উপরে টেনিসনের প্রভাব অতি অল্পই, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়র্থ শেলি কীট্‌সের প্রভাবের ফল তাঁর জীবনে ফুটেছে আরো পরে, 'বরং তিনি বোদলেয়রের মধ্যে পেয়েছেন তীক্ষ্ণতা'।—লেখকের এই বিশ্বাস নিয়ে আমি আপত্তি করছি না (যদিও তাঁর এই বিশ্বাসে আমার বিন্দুমাত্র প্রত্যয় নেই), আমার আপত্তি তাঁর যুক্তি শৃঙ্খলায়, অথবা বিশৃঙ্খলায়। তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি (যার উপরে সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত) কত দুর্বল। তিনি বলেছেন, 'বিলাতবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ যে বোদলেয়রের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এসম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না।' কেন সন্দেহ থাকতে পারে না? যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনীতে ক্ষুদ্রতম প্রমাণও পেতাম, ধূসরতম তথ্যের অস্পষ্টতম আভাসও পেতাম, (অথবা লেখক মহাশয় প্রমাণ ও আভাস দিতে পারতেন) না হয় এই সম্ভাব্য প্রমাণ সম্বন্ধে একটিবারও চিন্তা করতাম। কিন্তু কোথায় সেই অস্পষ্ট আভাসের ধূসরছায়া? নানা ঐতিহাসিক কারণে বোদ্‌লেয়রের stock ইদানীংকার সাহিত্যে খুব উঁচু কিন্তু ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম ইংল্যান্ডে যান অথবা ১৮৯০ সালে যখন দ্বিতীয় বার যান, তখন ইংল্যান্ডেই বোদ্‌লেয়রের প্রভাব কতটুকু ছিল? ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমাণ নেই যে স্যুইনবর্ন ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কবি বোদলেয়র কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই স্যুইনবর্নও বোদলেয়র ছেড়ে অচিরেই অন্যান্য দেবতার পূজা শুরু করেছিলেন। ঐ সময়টাতে ইংল্যান্ডের সাহিত্যিক মহলে যে বোদলেয়রকে নিয়ে কোনো বিশেষ চেতনা ছিল তার প্রমাণ সে-কালীন সাহিত্যিক তথ্যাবলীর আকরগ্রন্থগুলিতে পাই না। কিছুটা চেতনা বরং ১৮৯০ সালে ছিল, ১৮৯৪ সালে অব্রে বেয়ার্ড্‌স্‌লে তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি দিয়ে "ইয়েলো বুক্"-এর সংখ্যাগুলি ভরেছেন কিন্তু 'রাইমার্স্‌ ক্লাব'-এর নিগড়িত

সীমার বাইরে বোদলেয়র-চেতনা ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজে ছিল এমন প্রমাণ বড় একটা পাই না। যে-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রভাবক-প্রভাবিত সংযোগের কোনো প্রান্তেই পাই না, না ইংরেজি সাহিত্যে না বাংলা সাহিত্যে, যেখানে সিদ্ধান্ত শুধু আপ্তবাক্য, প্রমাণ শুধু সংশয়াচ্ছন্ন অনুমান, সেখানে তারকনাথ সেনের তথ্যপ্রত্যয়ী যুক্তিবাদী মনোভাব সমালোচনার প্রদেশে আবর্জনা-ঝেঁটানো স্বাস্থ্যকর হাওয়া। বোদলেয়র বা শেলি বা হুইট্‌ম্যান বা হাইনে বা অন্য কোনো বিদেশী বা স্বদেশীয় কবির প্রভাব রবীন্দ্রনাথে অবশ্যই আছে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বে সৎ সমালোচকের কাছে আমরা বলিষ্ঠ তথ্যের দাবি করব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিদেশী বা স্বদেশী প্রভাব থাকলে আমাদের ক্ষুব্ধ বা পীড়িত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনো লেখক বা লেখক-গোষ্ঠীকে মেনে থাকেন তাহলে আমরা বলব না, Did Rabindranath? If so, the less Rabindranath he! সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ চারিদিক থেকেই নিয়েছিলেন প্রচুর—কোনো মানবিক এনার্জি স্বয়ম্ভূ স্বয়ংসীমিত নয়—ইওরোপীয় সাহিত্য থেকে, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনেক প্রেরণা পেয়েছিলেন এমন কথা অনায়াসে অনুমান করা যায়। আমার ধারণায় (এই সামান্য গ্রন্থালোচনা প্রবন্ধে সে-ধারণার সমর্থক তথ্য ও যুক্তি পেশ করা সম্ভব নয়) ইংরেজি কাব্য থেকে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বহুপ্রকার ছত্রস্তবক বা স্ট্যান্‌জার আদর্শ। প্রাক্‌-রাবীন্দ্রিক বাংলা কাব্যে, এমনকি সংস্কৃত কাব্যেও স্ট্যান্‌জার রকমারি খুব বেশি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বহু স্ট্যান্‌জার সঙ্গে ইংরেজি কাব্যের স্ট্যান্‌জার অবয়ব-সাদৃশ্য নিবিড়। হয়তো স্ট্যান্‌জা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও (যেমন কাব্যের বিষয়ে বা প্রকরণে) সাদৃশ্য লক্ষ্য করব কিন্তু সৎ সমালোচনায় (প্রথমত) শুধু সাদৃশ্যটির উল্লেখই করতে পারি, নিঃসংশয় বাহ্যিক প্রমাণ ব্যতিরেকে সাদৃশ্য ও অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করব না। (দ্বিতীয়ত) সাদৃশ্য যদি নিকট বস্তু ও দূরের বস্তু উভয় বস্তুতেই তুল্যভাবে পাই (যথা বঙ্গীয় ও ভারতীয় ঐতিহ্যে, অথবা বঙ্গীয় ও ইওরোপীয় ঐতিহ্যে), তাহলে সিদ্ধান্ত হবে নিকট বস্তুর অনুকূলে। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে প্রতীচ্যজগৎ কোনো ছাপ রাখেনি এমন কথা কোনো পাঠক বলতে পারেন না। বস্তুত যে-উপনিষৎ রবীন্দ্রনাথের মর্মে মর্মে অনুবিদ্ধ, সে-উপনিষৎও ঠিক প্রাচীন উপনিষৎ নয়, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাত উপনিষৎ, সে-ব্যাখ্যায় আর্যচিন্তার সঙ্গে মিশেছে হাফিজের কাব্য, আরব চিন্তা, খ্রীস্টীয় দর্শন ও ইওরোপীয় ইতিহাস, মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্তদের আবেগ। আবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে-উপনিষদের ভাবার্থে কত ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন! অনেক প্রভাব নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাহী শিল্পচেতনায় ও মনীষায় পৌঁছেছিল। দেশ ও বিদেশ থেকে, সমসাময়িক ও অতীতকালীন, মানবিক ও নৈসর্গিক, প্রত্যক্ষ ও নির্বস্তুক অসংখ্য আবেগ ও চিন্তা তাঁর চিত্তে প্রবেশ করেছিল তাতে বিস্ময়ের কী? মহৎ শিল্পীর চেতনায় প্রচণ্ড গতিবেগ, অক্লান্ত গ্রহণক্ষমতা, অকৃপণ প্রদানশক্তি। প্রভাবের চেয়ে মহত্তর আত্মীকরণের শক্তি—সমালোচনা পদ্ধতির দুরূহতম লক্ষ্য সেই শক্তি। রবীন্দ্রনাথের সৎ সমালোচক জানবেন যে যাবতীয় প্রভাবের ঊর্ধ্বে শৈল্পিক আত্মীকরণের শক্তিতে রবীন্দ্রনাথের বিরাট চেতনা স্বমহিমায় ভাস্বর।*

অমলেন্দু বসু

* A Centenary Volume, Rabindranath Togore, 1861-1961. Sahitya Akademi. New Delhi. Rs. 30.00.

সমালোচনা

বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা ৯। মূল্য পঁচিশ টাকা।

কবিত্বের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণব পদাবলীই প্রাচীন বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সংস্কৃতে রচিত হইলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দই প্রথম পদাবলী, ইহার পরে বাংলায় যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সমগ্র গীতগোবিন্দ ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে। জয়দেবের পর চৈতন্যপূর্বযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। মৈথিলী ব্রজবুলিতে রচিত হইলেও বিদ্যাপতির পদাবলীকে বাংলার পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলাদেশের কীর্তন সঙ্গীতে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বাঙালীদের পক্ষে দুর্বোধ্য নয়—চর্যাপদের চেয়ে ঢের বেশি সুবোধ্য। বিদ্যাপতি ব্রজবুলির পদকর্তাদের গুরুস্থানীয়। খাঁটি বাংলায় রচিত পদাবলীর কবিদের গুরুস্থানীয় চণ্ডীদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পদাবলী ধারার বহুল প্রসার হয় এবং শত শত পদকর্তার আবির্ভাব হয়। তখন পদাবলী সংগ্রহের গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। এই সংগ্রহগ্রন্থগুলি একদিকে কীর্তন গায়কদের—অন্যদিকে বৈষ্ণব ধারায় যাঁহারা সাধনভজন করিতেন—তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে।

প্রাচীনতম সংকলন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর (পদকর্তা হিসাবে উপনাম হরিবল্লভ দাস) ক্ষণদাগীত চিন্তামণি। ইহাতে ৪৫ জন পদকর্তার ৩০৯টি পদ আছে—তন্মধ্যে সংগ্রাহক হরিবল্লভ দাসের পদসংখ্যা ৫১টি। এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন শ্রীমন্ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—টীকা, রসবিশ্লেষণ, পাঠান্তর ইত্যাদিসহ। এই গ্রন্থ এখন দুর্লভ। আশ্চর্যের বিষয় ইহাতে চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই। বোধ হয়—ইহা সংগ্রাহক হরিবল্লভ দাসের সংকলিত গ্রন্থের ১ম খণ্ড হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে চণ্ডীদাস ও অন্যান্য কবির পদাবলী বোধ হয় সংকলিত ছিল।

পরবর্তী সংকলন নরহরি চক্রবর্তীর (ঘনশ্যাম দাসের) গীতচন্দ্রোদয় সুবৃহৎ সংকলন পুস্তক। ইহাতে গৌর পদাবলীরই আধিক্য দেখা যায়। উজ্জ্বল নীলমণি প্রবর্তিত বিবিধ প্রকরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ পদসমূহ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকাংশ নিদর্শন ঘন-শ্যাম দাসের নিজেরই রচনা।

ইহার পর রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ৭৪৬টি পদ সংগৃহীত আছে—তন্মধ্যে রাধামোহনের পদ ২২৮টি, গোবিন্দদাসের ২৭০টি—বাকিগুলি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদের। এই সংকলনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য সংকলয়িতা পদগুলির সংস্কৃতে টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকা পদাবলীর রসবোধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

এই গ্রন্থের পর গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণবদাস) তাঁহার গুরুদেব রাধামোহনের পদামৃত-সমুদ্র সংকলনটিকে তাৎকালিক বিচারে সম্পূর্ণাঙ্গ করেন। তাঁহার সংকলনের নাম পদকল্পতরু। ইহাতে ১৩০ জন কবির ৩১০৩টি পদ সন্নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থই

স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে টীকা, ভূমিকা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সহ প্রকাশ করিয়াছেন। এত কাল এই গ্রন্থই আমাদের প্রধান সম্বল ছিল।

ইহার পরে গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ গ্রন্থখানিকে পদকল্পতরুর পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহাতে অনেক নূতন পদ আছে। দীনবন্ধুদাসের সংকীর্তনামৃত গ্রন্থখানিকেও পদকল্পতরুর পরিশিষ্ট বলা যায়। কারণ, এই গ্রন্থের পাঁচশত পদের অনেক পদই নূতন। বিশেষতঃ দীনবন্ধুদাসের নিজের ২০৭টি পদের একটিও পদকল্পতরুতে নাই।

নিমানন্দ দাসের পদরস সারের ২৭০০ পদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয়শত পদ পদকল্পতরুতে নাই—এইগুলি একুশজন অজ্ঞাতনামা কবিদের রচনা।

কমলাকান্তের পদরত্নাকর গ্রন্থে কয়েক জন অজ্ঞাতপূর্ব কবির রচনা আছে। প্রাচীন যুগের শেষ আবিষ্কৃত পদাবলী-সংকলনের পুঁথির নাম—পদকল্পলতিকা। ইহার পদসংখ্যা তিন শতের বেশি নয়—তন্মধ্যে চন্ডীদাসের পদই বেশি।

আধুনিক যুগের পদসংগ্রহগুলিতে নূতন পদ খুব কমই পাওয়া যায়—তবে সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য আছে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদিত পদরত্নাবলীর (কবিত্বগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ পদগুলির সংকলন)।

বর্তমান যুগে প্রকাশিত পদাবলীসংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংকলিত গৌরপদতরঙ্গিণী। ইহার সকল পদই শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক ও মহাপ্রভুর পার্ষদ-র পরিকরগণে প্রশস্তিমূলক ও মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ইহাতে ১৫১৭টি পদ সংগৃহীত। ইহার বহু পদই পূর্বতন পদাবলী-সংকলনগুলিতে নাই।

পদকল্পতরুর কথা আগে বলিয়াছি—কিন্তু ইহার অভিনব রূপের কথা বিশেষভাবে আলোচ্য। পদকল্পতরুর পদসংগ্রহের দিক হইতে স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায়ের কৃতিত্ব নাই—কিন্তু ইহার সম্পাদনা ইহাকে অভিনব রূপদান করিয়াছে। ইহার ভূমিকা, ইহার ব্যাখ্যা, পাঠান্তর-আবিষ্কার ইত্যাদি যেমন শ্রমসাপেক্ষ, তেমনি পান্ডিত্যপূর্ণ। ভণিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বাদানুবাদমূলক আলোচনাও সুচিন্তিত। পদের ভাষার বিশুদ্ধি নির্ণয়েও সম্পাদক যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন।

আর একখানি উল্লেখযোগ্য সংকলন—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পদামৃত-মাধুরী। তিনি তাঁহার সংকলনের পরিচয়ে বলিয়াছেন 'চারিখন্ড পদামৃত মাধুরীতে প্রায় ২৫০০ পদ দেওয়া হইয়াছে, সমস্ত পদগুলি পালাকারে সাজানো হইয়াছে। যাহাতে এক-একটি রসের অভিব্যক্তি ও বিকাশের ধারা সহজেই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন পদকর্তার পদ পরপর বসাইয়া একটি রসপ্রবাহকে জীবন্তভাবে অনুভব করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আমি পদনির্বাচনে প্রায়শঃ পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ গায়ক মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।'

বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুর পর সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী এ সংকলনের পদসংখ্যা ৩৭৫৬, পদকল্পতরুর পদসংখ্যা ৩১০১। পদ-সংকলনের গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। এই গ্রন্থে নূতন পদ অনেক আছে—পদকল্পতরুর কোন কোন পদ ইহাতে গৃহীত হয় নাই। তবে সংস্কৃতে রচিত হইলেও গীতগোবিন্দের পদগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি অন্য কোন সংকলনে নাই, ইহার উল্লেখযোগ্য পদগুলি আলোচ্যমান

গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা পাঠকদের সুপরিচিত নয় বলিয়া গ্রন্থকার সেগুলিরও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। শ্রীরূপ, রায় রামানন্দ ইত্যাদির সংস্কৃতে রচিত পদের এবং গোবিন্দদাস, জগদানন্দ ইত্যাদি পদকর্তার ব্রজবুলিতে রচিত পদের ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের উদ্দেশে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন—স্বর্গত সতীশচন্দ্রও এই গ্রন্থকারের নিকটে বারবার ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে মুদ্রিত পদ গ্রহণকালে গ্রন্থকার অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া লইয়াছেন—নানা পুঁথি মিলাইয়া গ্রন্থকার বিশুদ্ধ পাঠের উদ্ধার করিয়াছেন।

এই সংকলন ও পদকল্পতরু দুই গ্রন্থেই রাগরসের ক্রমোন্মেষের বিবিধ প্রকরণের অনুক্রমে পদগুলি সুবিন্যস্ত। পদকল্পতরুতে সমগ্র পদাবলীকে বিবিধ প্রকরণে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রকরণে বিভিন্ন কবিদের পদগুলিকে তদনুযায়ী সাজানো হইয়াছে। আর এই সংকলনে পদকর্তার নাম অনুসারে পদগুলিকে প্রথমতঃ বিভক্ত করা হইয়াছে–তৎপরে এক-একজন কবির সর্ব প্রকরণের পদগুলিকে রসানুক্রমে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

যেমন—আক্ষেপানুরাগ একটা প্রকরণ—এই প্রকরণের মধ্যে যে যে কবির যে যে পদ পাওয়া যায় সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে—পদকল্পতরুতে। সবগুলি মিলিয়া কীর্তনের একটি পালা দাঁড়াইয়াছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলনে একজন পদকর্তা—যেমন গোবিন্দদাস, তাঁহার বিবিধ প্রকরণের কবিতাগুলিকে একের পর এক ক্রমোন্মোষের পরম্পরায় সাজানো হইয়াছে। কবি বিশেষের সম্বন্ধে আলোচনার ইহাতে সুবিধা হইয়াছে। পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের পদগুলি সমগ্র সংকলনে ছড়ানো আছে—ইহাতে একত্র সংগৃহীত আছে—অথচ সেগুলি বিবিধ প্রকরণে বিভক্তও আছে।

এই সংকলনের একটি বৈশিষ্ট্য—বিশেষ যত্নের সহিত শব্দার্থগুলিকে শেষে সংযোজিত করা হইয়াছে। যে শব্দ একাধিক অর্থে পদাবলীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার একাধিক অর্থও দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাকে অনাবশ্যক বাড়ানো হয় নাই। যেমন—ক্রিয়া পদটিরই অর্থ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাল ও পুরুষ ধরিয়া প্রত্যেক রূপটির অর্থ দেওয়া হয় নাই। পাঠকের ইহাতে অসুবিধার কারণ নাই।

এইরূপ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পদাবলীসংকলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই প্রয়োজনের দাবি দক্ষতার সহিত মিটাইয়াছেন।

কালিদাস রায়

জলবিম্ব—চিত্ত সিংহ। সৃজনী। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।
ব্যঞ্জনবর্ণ—অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্রালয়। কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।
শিমুলফুলের ছায়া—নৃপেন্দ্র সান্যাল। আনন্দধারা প্রকাশন। কলিকাতা ১২। মূল্য আড়াই টাকা।
কুয়োতলা—শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সৃজনী। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

ইদানীং নবীনদের মহলে এই বোধই প্রায় সর্বব্যাপী যে, এ-যুগ সর্বহারা। এ শুধু

এ-দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও। এ-কালের অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। এ দুর্যোগে তাৎক্ষণিকতাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত। বাংলা গদ্যে-পদ্যে জীবনসত্যের নামে রুচির এই প্রকৃতি এবং মনের এই মেজাজই নতুন কিছু করতে উদ্যোগী।

সাহিত্যের এ-আসরেও সমালোচনা চলছে, চলবেও। তবে, লেখক যাঁরা, তাঁদের মর্জি সম্বন্ধে সমালোচকের পক্ষে অন্তত এই ধারণাটুকু ন্যূনতম আবশ্যিক শর্ত, যে, তাৎক্ষণিকতার দুর্দিনেও পাঠককে লেখক জ্ঞানতঃ উপেক্ষা করবেন না,—সমালোচকের বক্তব্য তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে শুনবেন,—শুনে ভেবে দেখবেন,—কারণ, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবেদন মনুষ্যের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের কাজ।

যুগে-যুগে সাহিত্যিকের মন বদলায়। দেশে-দেশে সে-মনের বিচিত্রতা দেখা দেয়। কিন্তু এক মনের সঙ্গে অন্য মনের যতো পার্থক্যই থাক্ না কেন,—যাঁরা মানুষ নিয়ে কাজ করেন, মানুষের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা হারানো তাঁদের পক্ষে বেমানান। পাঠকের কথাও শোনা দরকার, লেখকদের পরীক্ষাও অনুকূল মেজাজে ভেবে দেখা দরকার।

চিত্ত সিংহের "জলবিম্ব" ১৯৫৯-এর জুলাই থেকে ১৯৬১-র জানুয়ারির মধ্যে লেখা হয়। একে উপন্যাস বলা হচ্ছে। দুটি প্রধান খণ্ডের প্রথমটিতে নায়ক শুভ-র কথা; দ্বিতীয়টিতে নায়িকা ঋতু-র কথা; তৃতীয়াংশের নাম 'লেখকের কথা'। এই তৃতীয় অংশ কেবল এইটুকু: 'বলা বাহুল্য শুভর কথা একান্তভাবে শুভরই কথা, এবং ঋতুর কথাও আমার অর্থাৎ লেখকের কথা নয়।' এ-ছাড়া তৃতীয় অংশে লেখকের আর কোনো কথা নেই। সে-অংশে পৃষ্ঠাসংখ্যাও ছাপা হয়নি। ডিমাই আট-পৃষ্ঠায়-একশীট মাপের ১১৮ পৃষ্ঠাতেই আসল কথা শেষ হয়েছে। নায়িকার স্বামীর নাম প্রসাদ। শুভ পরস্ত্রী-প্রণয়ী। ঋতু পুত্র-কন্যার জননী। নায়ক নিজেই জানিয়েছেন: 'ঋতু পরস্ত্রী। আমার দূর সম্পর্কের এক মামার স্ত্রীর সহোদরা।...ঋতু তার স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল, ভালবেসে। তবু ঋতু আমাকে চায়। জন্মান্তরে আমাকে কামনা করে। আমি জানি ঋতু আরও দুজনকে ঠিক একথাই বলেছিল। ওর দিদির দেওর কল্যাণকে আর ওর স্বামীর বন্ধু সৌমিত্রকে।' নায়ক শুভ আরো জানিয়েছে, ঋতুদের ধারণা—পুরুষের মন 'শতলক্ষ বৎসরের সাধনার ধন'! নায়কের আর একটি মন্তব্য: 'ঋতু! ভোগেই সুখ।' নায়কের তাৎক্ষণিকতাবাদ ছলনামাত্র। নানাবিধ বিকৃত কামেচ্ছার সঙ্গে রাজনীতি-প্রসঙ্গ,—জীবনের মূল্যবোধের কথা [যেমন ৪০ পৃষ্ঠায়—'কতগুলো পুরোন মূল্যবোধ আমার বিশ্বাসে স্থায়ী আসন দখল করেছিল--তার অন্যতম 'বন্ধুত্ব'।'], —তাছাড়া দুঃখবাদ এবং আপেক্ষিকতাবাদ [যেমন ৩৮, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায়—'আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক, কোন মন্তব্যই শেষতম নয়।...আমরা সত্যই দুঃখবাদী।'],—কয়েকবার ভগবানের উল্লেখ [ঐ],—'স্তাঁদালের ভালবাসার থিওরী' [পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮],—রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি'র চুম্বন-প্রসঙ্গ [পৃষ্ঠা ২০],—নায়িকার উক্তি—'এই দেহকে ঘিরেই না আমাদের সমস্ত কথা কবিতার মতো দানা বেঁধে ওঠে, আমাদের জীবন শিখার মতো জ্বলে, আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলো ধূপের মতো পোড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যেই-ই সহজলভ্য হোলো, অমনি সব নিঃশেষ, সমস্ত সমাপ্ত, সব কিছুর ইতি' [পৃষ্ঠা ৬৩],—নায়কের মন্তব্য—'কাফ্কা থেকে কামু, রিল্কে থেকে এলিয়ট, গঁগা থেকে মাতিস, মার্কস থেকে ম্যান্হাইম, কান্ট, ক্রোচে, নিউটন, আইনস্টাইন সব নাম ত আমার কণ্ঠস্থ' [পৃষ্ঠা ১৩]—এইসব অদ্ভুত বৃত্তান্তের সমাবেশ এই "জলবিম্ব"! লেখক আদিতেই জানিয়ে দিয়েছেন—'খণ্ডপাঠে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উপর অবিচারের সম্ভাবনা প্রবল।' তাঁর নির্দেশ

পালিত হয়েছে। সমালোচক পুরো বইখানিই পড়েছেন। সেইসঙ্গে শান্তি চট্টোপাধ্যায়ের "কুয়োতলা," নৃপেন্দ্র সান্যালের আটটি গল্পের সংগ্রহ "শিমুল ফুলের ছায়া" আর, অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের "ব্যঞ্জনবর্ণ"ও পুরোপুরি পড়া গেল। নৃপেন্দ্র সান্যাল কোনো উগ্র অর্থে 'আধুনিক' নন। প্রথম গল্প 'তৃতীয় পুরুষ'-এ যদিও আয়নার সামনে সুমিত্রার অন্তর্বাস প'রে নেবার বর্ণনা আছে, দ্বিতীয় গল্প 'টাইপরাইটার'-এ যদিও নিরঞ্জন-অণিমার সান্নিধ্য সত্যিই তীব্রতর সম্ভাবনার খুবই সন্নিহিত,—এবং 'ইস্কাবনের বিবি'-তে,—'ভগ্নাংশ', 'চুড়ি'. বা বইয়ের নামগল্প 'শিমুল ফুলের ছায়া'-তেও তাঁর বিষয় নির্বাচনের এমন আগ্রহ দেখা দিয়েছে, যাতে—ক্ষীণভাবে হলেও একালের ব্যাপক দেহবাদের কথা মনে পড়ে যায়,—তবু, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ঠিক দেহবাদীও নন, তাৎক্ষণিকতাবাদীও নন। তিনি একালের সময়সীমাচিহ্নিত মানবজীবন-প্রবাহের রূপটাই ধরতে চেয়েছেন। ভবিষ্যতে, গল্পের আঙ্গিকে তাঁর অধিকার সত্যিই অকুণ্ঠ হবে, হয়তো। গল্পের আবেদনও তখন সার্থকতর হবে।

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাহিনীর ঘটনা ক্ষেত্র হিসেবে ঢাকা-কলকাতা--দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এই দু'শহরে মনোযোগী হয়ে,--ঢাকার রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে মণি নামে এক যুবক যে কীভাবে কল্যাণী নামে এক যুবতীকে উপেক্ষা করেছিল, অঞ্জলি মেয়েটিকে শরদিন্দু যে কোন্ প্রত্যাশিত দুরবস্থার তাড়নায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল,—এবং এই রকম আরো প্রণয়-প্রসঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক এ-কাহিনীর কথক অমলেরই আত্মকথা ব্যক্ত করেছেন। ঢাকায় রাজনীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে 'ইনটার্নড্' সন্ত্রাসবাদী যুবক অমল,—তার বন্ধু সঞ্জীব, মণি, অশোক ইত্যাদি অন্যান্য যুবক ছাত্র,—অমলের বাবার বন্ধু 'হোম ডিপার্টমেণ্টের' আই-সি-এস্ সেন সাহেবের তিনটি মেয়ে সুস্মিতা, সুনীতা, সুজাতা,—এবং অঞ্জলি প্রভৃতি অন্যান্য মেয়েদের সান্নিধ্যে এরা যে মশগুল থেকেছে, সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীই "ব্যঞ্জনবর্ণ"। রাজনৈতিক কারণে সে-যুগে যাঁরা পুলিশের নজরবন্দী থাকতেন, তাঁরা সত্যিই অন্য আদর্শে বিশ্বাস করতেন। দেশপ্রেমের বাইরে যুবতী-সঙ্গে তাঁরা সত্যিই নিজেদের অধিকারী বলে মনে করতেন না। তাই এ-কাহিনী শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, বিপজ্জনক। এক কালের যা ছিল অকৃত্রিম তপস্যা, পরবর্তী কাল তাকে এভাবে বিকৃত করবে, এ যে বড়োই গর্হিত আচরণ! এই অদ্ভুত মিশ্রণের মধ্যেই বিভিন্ন কারণে স্মরণীয় 'লাড়ুমামা', 'ভোলাদা,'—মিসেস্ ওয়ারেনের স্মারক চরিত্র 'পুঁটিমাসী,'—বনফুল আর তারাশঙ্কর, একসঙ্গে দু'জনের প্রভাবের ধারণা জাগিয়ে-তোলা চরিত্র 'মহাভারত শা' ইত্যাদি দেখা দিয়েছেন। লেখকের গল্প চালিয়ে নিয়ে যাবার সামর্থ্য আছে। কিন্তু নজর বদলানো দরকার।

জীবনকে যথার্থ সত্যস্বরূপে দেখা যে কী রকম, সে-কি বাইরে থেকে বলবার কথা? পাঠক নির্দেশ দেবেন কেন? লেখককে ফরমাশ করা কি ধৃষ্টতা নয়? সমালোচকের শক্ত কাজ। লেখকরা আত্মম্ভরিতা, আস্ফালন যাই দেখান না কেন,—তাঁদের বিপদ কমই। সময়ের কষ্টিতে যাচাই হ'য়ে তাঁরা হয় উৎরে যাবেন, না-হয় সরে যাবেন। কিন্তু সমালোচকের ধৃষ্টতার ক্ষমা নেই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদদের গ্লানি যে কিছুতেই মোছে না, কোনো-কালে কেউ ভুলবে না!

রোম্যাাণ্টক মেজাজের দিন শেষ হয়েছে,—ভঙ্গিতে, আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে এখন

পালাবদল—এইটেই তীব্রভাবে লেখকরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যে ঢেউ থেকে বড়ো সৃষ্টি দেখা দেয়, এ সে-ঢেউ নয়। এ বিষয়ে পাঠক আর লেখক, কোনো পক্ষেই কোনো মোহ থাকবার কথা নয়। বোঝা যাচ্ছে, এই হুজুকটা ছড়িয়ে পড়ছে। হুজুক বন্ধ করবার মতন মনোভাব অথবা সামর্থ্য যদি না দেখা দেয়, তাহলে এই হুজুকেই দুলতে হবে,—হুজুকই পাঠকসমাজকে আছড়ে ঠাণ্ডা করবে। কিন্তু তবু, দু'পক্ষই এই কথাটা ভেবে দেখা ভালো যে, যে-দেহবাদ শেষ হয়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে এনে লাভ কী? আঙ্গিকে যে খেলা অন্য দেশে,—এবং এ-দেশেও কেউ না কেউ দেখিয়ে গেছেন,—যার তুচ্ছতা সুস্থ মনে অনেকেই অনুভব করেছেন,—সেই উল্‌ফীয়-জয়েসীয় মনঃসমীক্ষায় আর দরকার কিসের? শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রুস্তের শিষ্য কিনা জানি না,—তাঁর "কুয়োতলা"র মলাটে জানানো হয়েছে: 'প্রকৃতিবাদী এবং অলঙ্কারমুখর উপন্যাসের স্থায়ী উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল মার্শেল প্রুস্তের রচনায়। বর্তমান প্রতীকী ও ফলতঃ স্বল্পায়তনিক নভেল-বিন্যাসের মধ্যে প্রকৃতিবাদ এক খণ্ড বিরোধ। তা সত্ত্বেও "কুয়োতলা" নামের এই গ্রন্থে ভূতগ্রস্ত শৈশবাচ্ছন্ন নিরুপমের দেহের প্রতি উপর্যুপরি আঘাত, আকস্মিকতার অবস্থান অস্বীকার করে ধর্মাধর্মময় ভাগ্য-তাড়িতই, মনে হয়। মনে হয়, এমন ভীতিকর অতিরিক্ত দেহপরবশ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত মাত্র।' এই নিরুপমের বিষয়ে ঐ মলাটেই জানানো হয়েছে: 'আধুনিক মানুষ জন্মাবধি যে-তদন্তের সহিত যুক্ত, সেই অমোঘ তদন্তে পর্যুদস্ত নিরুপমের আত্মা, শেষপর্যন্ত নিরুপমকে জয় করে। এখন থেকে প্রতিটি বালকই দুরপনেয় পাপমুখর এবং যৌনপ্রহৃত। প্রতিটি স্বাভাবিক এবং নির্লিপ্ত মৃত্যুর ওতপ্রোত 'আমায় দোষী করো' এই নিবেদনখানি গ্রীকসাহিত্যের নিয়তিবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘোষণা করে।' "কুয়োতলা"র রচনাকাল ১৯৫৬-৫৭। মলাটের নিরুপম-পরিচিতিটুকুর জন্যে লেখককে ধন্যবাদ। তিনি নিজেকে যা ভাবছেন, এই ছোটো লেখাটুকুর মধ্যে সে-কথা জানিয়ে দেওয়ায় পাঠক কিঞ্চিৎ প্রস্তুত হয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন। উপন্যাসে প্রবেশ করেই নিরুপমের দাদুকে দেখা যায়,—নিরুপমকে তো বটেই,—হৈদরদাকেও,—যে পুকুরের চারদিকের বারোটা নারকেল গাছ ছাড়িয়ে এক কাহন ডাব, এক ডাঁই ডেকলো ইত্যাদি নামিয়েছে। পুকুর, জানলার ধারে আতাগাছ, দুপুর, রাত্তির,—রাতের প্রসঙ্গ থেকেই বড়ির ঝোলে জিরে পোড়ার গন্ধ,—টাকুমাসি,—টাকুমাসির দেহের প্রসঙ্গ ইত্যাদি এসে পড়েছে। প্রতিবেশী মাস্টারের লালচে বাড়ি,—সবিতাদি,—শামলি,—শরতের আকাশ,—'পাতায় পাতায় চেরা আকাশ বলো, যাই বলো, ঢালাও শুয়ে শামলির মতো',—ইষ্টিশান,—লাইন ধরে হাঁটা বারাসতের দিকে—ইত্যাদি ভাব-ভাবনা-স্মৃতি-কল্পনার স্রোত বয়ে চলেছে। এই স্রোতে বাংলাভাষার শব্দ-সম্ভারেও নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। সবিতাদিকে তার 'ভাই-ভক্কর' ধরতে হয় [পৃষ্ঠা ১১],—কচুপাতায় জল পড়লে রোদে 'মিক্‌মিক্' করে [পৃষ্ঠা ৩৫],—অল্প জ্বর বোঝাতে 'উসোম-উসোম' [ঐ]—ভিরকুটি অর্থে 'চেরপুট্টি' [পৃষ্ঠা ৪৭]—হঠাৎ উদ্ভট শব্দ, যেমন 'সম্মুখ্' [পৃষ্ঠা ৯৩]—এসব তো আছেই, তাছাড়া, সজ্ঞান মনের আরো নিচে থেকে তুলে-আনা নিহিততর ছবিও দেখা দিয়েছে, যেমন—'চিরদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখা হবে...আলোর বেলা-গুলো নিমজ্জমান ইঁদুরের আলোর প্রতি স্তব্ধচেতনার মতো...' [পৃষ্ঠা ৯৩],—'জ্যোছ্‌ছনা মানে ভীষণ উপর্যুপরি আলো, ভীষণ উপর্যুপরি ছায়া' [পৃষ্ঠা ৯১]! এই বালক নিরু-পমের বাবা মদ খেতেন,—'ফোটোগ্রাফের মুখচ্ছবি বাবার ছিল ভীষণ কদাকার, কালো, ক্ষতবিক্ষত ছিল নাকের দুই পার্শ্বদেশ, নাক ছিল ষাঁড়ের কুকুদের মতো'—বাপের মৃত্যু, বোধ

হয় হত্যা, পুলিশ এই সন্দেহ করেছিল—এই টুকরো টুকরো খবরের মধ্যেই ভীষণ কোনো রকম,—গূঢ়তর কিছু একটা আঘাতের ইশারা ফুটেছে বইয়ের শেষ ক'পৃষ্ঠার ছত্রে ছত্রে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ী, সন্দেহ নেই। কিন্তু সার্থকতা যে অন্য রাস্তায়, অন্যতর উপলব্ধিতে,—সে-কথা কে তাঁকে বলে দেবে? বোধ হয়, বাইরে থেকে এসব বলা নিষ্ফলতা! বাস্তব জীবনসত্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেবলমাত্র প্রথারক্ষার জন্যে রোমান্টিক হবো না,—নীতির দিকে নজর রেখে, সমাজের কল্যাণের জন্যেই বিকৃতিকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করতেও চাইবো না—এ সংযম স্বেচ্ছাসাধ্য। বাইরে থেকে বলতে গেলে অনর্থক কথা-কাটাকাটি ঘটে। অতএব সে কথা যাক্।

মানুষের মনে আইনভঙ্গ আন্দোলন চালাবার ঝোঁক দেখা দেয় মাঝে মাঝে। সতেরো-আঠারো শতকে বিজ্ঞানমনা ইউরোপে গণিত আর পদার্থবিদ্যা চর্চার আবহাওয়ায় ঈশ্বরকে নিখুঁৎ যন্ত্রবিশারদ—ঘড়ির কারিগর ভাবা হয়েছিল। সে রূপক সর্বশ্রুত। তারপর, সে-আমলের সেই রিয়ালিজ্‌ম্‌ চর্চার বিরুদ্ধে, নিয়মবিধৃতির বিরুদ্ধে, আবার ব্যক্তিমনের বিদ্রোহ দেখা দেয়। হোয়াইটহেড্‌ সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। জগৎ যে নিখুঁৎ কোনো যন্ত্রের চেয়ে বিস্ময়জনক, ব্লেক-ওয়ার্ডস্বার্থ প্রভৃতি নব্য রোম্যান্টিকদল সে-কথা জানিয়ে গেছেন। সেই উনিশ শতকেই আবার জীববিদ্যার চর্চা থেকে বিবর্তনবাদে অভিরুচি ছড়িয়েছে। জোলার উপন্যাসে 'ন্যাচারালিজ্‌ম্‌' বা প্রকৃতিবাদ দেখা দিয়েছিল। ফ্রান্সেই সে-মর্জি প্রশ্রয় পেয়েছে সর্বাধিক। সাহিত্য-ইতিহাসকার তেইন ছিলেন সেই মেজাজের মানুষ। ফ্লবেয়ারের বস্তু-সত্যানিষ্ঠা কে না জানেন? সেই উনিশ শতকেরই শেষদিকে আবার একভাবে ব্যক্তিমনের প্রাধান্য মাথা তুলেছিল—সাহিত্যের প্রতীকী আন্দোলনে। আমাদের এই শতকেও ইউরোপে কতোবার কতো মেজাজের পরিবর্তন দেখা গেল! আজ বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজের দুরবস্থা যে ভয়াবহ, তাতেও সন্দেহ নেই। যে-আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত সমাজ মাত্র কয়েক দশক আগেও মা-বাপকে,—দেশের স্বাধীনতার আদর্শকে,—শান্তি-সৌন্দর্য-কল্যাণবোধকে সত্যিই শ্রদ্ধা করেছে, আজ সমাজের সেই স্তর থেকেই অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন মাত্র মুখর হয়ে উঠছে। অবিশ্বাস, অবসাদ, চিত্তবৈকল্য, যাই ঘটে থাক্—তাকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলতে হলে কোন্‌ নেতার নেতৃত্বে নির্ভর চাই? বঙ্কিমচন্দ্রের মতন সহিষ্ণু শক্তিধরকেও একদিন অক্ষম রচনা সম্বন্ধে ছারপোকার তুলনা দিতে হয়েছিল।—সে অবিশ্যি পুরোনো কথা। ১২৮১ সালের মন্তব্য। এখন সে বঙ্কিমও নেই, সে বাংলাদেশও নেই। এখন পাঠক অনেক কিছুই মেনে নেন, লেখকরা অনেকটাই নিরঙ্কুশ। দেশে সাহিত্যের খেলাতেও 'রেফারি' ক্রমশঃ প্রবল পক্ষের বশম্বদ হবেন যে, তাতে সন্দেহ নেই। তবু, ঠাট্টা নয়, রাগারাগি নয়,—দলের কিংবা পত্রিকার বা ঐ ধরনের অন্য কোনো রকম জোরেই সাহিত্যের আসরে কোনো কৃত্রিমতাকে বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা যায় না, যাবে না। তবে, এও ঠিক, যে, তাৎক্ষণিকতার নেশা সে-দিক থেকেও নিরঙ্কুশ। কারণ, এ-অনাচারও অন্যান্য অনাচারের মতোই ক্ষণস্থায়ী! এর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-ইতিহাসের জাদুঘরে!

হরপ্রসাদ মিত্র

অন্যভুবন—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বর্তিক। কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

দীর্ঘদিন এরকম একখানি সংকলন গ্রন্থের আশায় ছিলাম। তাই বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেবার অবস্থা ঠিক সে সময় আকস্মিকভাবে "অন্যভুবন" বইখানি হাতে এলো।

"অন্যভুবন" প্রচলিত অর্থে ভূতের গল্প নয় বা চলতি ধরনের ভূতুড়ে কাহিনীও নয়। এগুলির একদিকে রয়েছে আমাদের মনের গহনলোকে প্রচ্ছন্ন-বিদ্যমান এক অজানিতের আতঙ্ক-আভাস, শতাব্দীব্যাপী যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চা যাকে এখনো ভিটেছাড়া করতে পারেনি—অপরদিকে যথার্থ সাহিত্যের স্বাদ।

এই ভুবনের, মর্ত্যের মানুষ আমরা। কিন্তু অনিবার্যভাবেই মনে মনে আমাদের অন্য আর একটি অজানা রহস্যময় জগতের 'বাসনা' বা 'সংস্কার' আছে—সেই রহস্যময় জগতের দরজা খোলার কথা অবশ্য মৃত্যুর চৌকাঠ পেরিয়ে। সেই জগতে যারা চলে যায় তারা অনেকেই ছেড়ে-যাওয়া ঘর বা পরিজন কি প্রিয়জনের মায়া নাকি পুরোপুরি এড়াতে পারে না। তারা কখনও কায়ায় কখনো বা ছায়া নিয়ে বিচিত্র রূপে সহসা এসে দেখা দেয়—এমন 'বিশ্বাস' আমাদের মনে অনেকেরই আছে। এবং আমাদের মনের এইসব ধারণা বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল কত অশরীরী আত্মার কাহিনী। এখন বিজ্ঞানের, যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের যুগ। অর্থনৈতিক তথা সামাজিক রূপান্তর ঘটছে বিস্ময়কর বেগে। যন্ত্র-শিল্পের সর্বগ্রাসী প্রভুত্বে আলো-আঁধারি ভাবটাই যেতে বসেছে। তাই গা-ছম্‌ছম্‌-করা নির্জন ভাঙা পড়োবাড়ি, ঘন বনজঙ্গল, ধু-ধু করা শ্মশান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে লোকবসতির চাপে। কাজেই অন্যভুবনের স্পর্শবহ পূর্বের অনুষঙ্গগুলি ক্রমে যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম'—। আমাদের গ্রামীন কাঠামো ও পল্লীপরিবেশ ক্রমলুপ্ত হলেও নাগরিক জীবনে সেই 'অজানিতের আতঙ্ক' কোনোদিন মিলিয়ে যাবে না। মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ ফ্ল্যাটের দরজায় মিলিয়ে-যাওয়া মৃদু করধ্বনি, হঠাৎ নিশীথে টেলিফোন বেজে ওঠা এবং অপর প্রান্ত থেকে অশরীরী কণ্ঠস্বর ভেসে আসা; হাসপাতালে শিশু রোগীর ওয়ার্ডে হঠাৎ তার মৃতা মায়ের চকিত আবির্ভাব; হাসপাতালের মর্গে কঙ্কালের অট্টহাসি—এ সবই তো শহরের বুকের ঘটনা। অন্যভুবনের ডাক বা স্পর্শ গ্রাম-নগরের বিভেদ মানে না।

কাজেই সেকালের গ্রামের সংস্কারবদ্ধ মানুষে ও একালের শহরের যন্ত্রবিশ্বাসী নাগরিকে যত পার্থক্যই গড়ে উঠুক সেই মৌল 'সংস্কার' যাবে কোথয়? তবে এখানে একটি কথা আছে। আগে ভৌতিক কথা কোবিদ গ্রাম্য বৃদ্ধরা ছিলেন, তাঁরা চমৎকারভাবে গুছিয়ে গল্প বলতেন। আমরা বাল্যকালে সে রকম গল্পের স্বাদ পেয়েছি। ঘনঘোর বর্ষার রাত্রে ঘরের কোণায় লণ্ঠনের আলোয় গুটিসুটি মেরে বিস্ময়ে-কৌতূহলে-ভয়ে যে রোমাঞ্চ রস আস্বাদন করেছি তার আয়ু একালে বেশিদিন স্থায়ী হবার কথা নয়, কেননা তার মধ্যে মনে পড়ছে বেশি থাকত আতঙ্ককর ঘটনা। সে ভয় জাগাতে পারে কিন্তু আধুনিক কালের মত সূক্ষ্ম 'ভীতিরস' সেই 'awe and mystery' জাগাতে অক্ষম। অতীন্দ্রিয় স্পর্শধর্মী রহস্যরস-পরিবেষণক্ষম সে ঠিক ছিল না। তাই আধুনিক কালে যে-অতি-প্রাকৃত 'রসে'র গল্প লেখা হচ্ছে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের অভিনব 'ইলিউশন্‌'—যার স্বাদ একমাত্র উঁচুদরের সাহিত্যেই লভ্য। "অন্যভুবন"-এ সংকলিত গল্পে সেই কাব্যাস্বাদসহোদররস পরিবেষণ-প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

ডঃ সুকুমার সেন ঠিকই লিখেছেন যে 'সত্যকার ভূতের ভয় থাকলে কেউ ভূতের গল্প শোনে না'। তেমনি যার সত্যি ভয় আছে সে ঐ গল্প বলতেও পারে না, লিখতেও পারে না। কাজেই লেখক ও পাঠক দুজনকেই 'সত্যকার' ভূতের ভয় থেকে বিমুক্ত থাকতে হবে। তবেই যথার্থ অতি-প্রাকৃত-রস সঞ্চার সম্ভব, শিল্পের স্বাদ তখন আসবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ভূতকথা যুগপৎ বলতে ও শুনতে ভালোবাসতেন এবং তিনিই আমাদের সাহিত্যে অতি-প্রাকৃত রসসঞ্চারী গল্পের শ্রেষ্ঠশিল্পী। তাঁর 'নিশীথে' 'মণিহারা' 'ক্ষুধিত পাষাণ' তিনটি উজ্জ্বল তারকার মত আমাদের ছোট গল্পের আকাশে চিরদীপ্যমান। প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে অতি-প্রাকৃত রহস্যের উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণে তিনি এমন এক 'বিশ্বাস্য' জগত গড়ে তুলেছেন যার তুলনা আমাদের বাংলা ছোট গল্পে বিশেষ নেই। সম্পাদক অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'নিশীথে' গল্পটিকে প্রথম স্থান দিয়ে যোগ্য করে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্ত, পরশুরাম, ধূর্জটিপ্রসাদ, মণীন্দ্রলাল বসু থেকে সমরেশ বসু পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল লেখকের রচনাই এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে অন্যভুবনের রহস্যবহ ভালো লেখা অপেক্ষাকৃত কম। কলাকৌশল বা সংখ্যা কোনো দিক থেকেই বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে এই পর্যায়ে আমরা সমকক্ষতা দাবি করতে পারি না।

সম্পাদক বিমলাপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে তাঁর যে-মন্তব্য পেশ করেছেন সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

'বিদেশী সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যে ভূতের গল্প কিছু জোলো ও ফিকে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দুর্বল, জলমাটির গুণে ভৌতিক চরিত্রেও বোধ হয় তারতম্য ঘটে। শুধু রবীন্দ্রনাথ এবং একাই রবীন্দ্রনাথ।...তাঁকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা নগণ্য না হলেও এমন বেশি কিছু নয়।" (পৃঃ ১৩)

এই সংকলনে এমন কয়েকটি গল্প আছে যেগুলি সম্পর্কে পাঠক তাদের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কেননা সোজাসুজিভাবে ধরলে সেগুলি ঠিক অন্যভুবনের গল্প নয়। কিন্তু সম্পাদকের পক্ষে বোধ করি এর জবাবে বলা যায় যে ঐ বিতর্কিত গল্প-গুলিতে 'পাঠককে অস্বস্তিকর, অপ্রীতিকর অথচ ভালো-লাগা কয়েকটি মুহূর্ত' উপহার দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে জেগে উঠেছে এক ধরনের ভীতিরসাশ্রিত রোমাঞ্চ—যা আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত চেতনাকে স্তব্ধ করে দিয়ে নিজের 'awe and mystery'র জগত প্রসারিত করেছে। কাজেই "অন্যভুবন" আমাদের বাংলা সাহিত্যে 'অতিপ্রকৃত রস' পরিবেষক হিসাবে স্মরণীয় সংকলন।

সম্পাদনার কার্যে বিমলাপ্রসাদ একদিকে যেমন দক্ষ সংগ্রহকর্তার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে বইয়ের গোড়ায় তাঁর দীর্ঘ ভূমিকা-প্রবন্ধটি রচনায় যে ব্যাপক অধ্যয়ন, তীক্ষ্ণ মনন, সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি ও মজলিসী মেজাজের পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে তার সদৃশজন ক্রমবিরল হয়ে আসছে। বিমলাপ্রসাদ সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'রসপ্রবন্ধ' ('রম্য রচনা' নয়) রচয়িতা। আগেকার কালের গুণীব্যক্তির বৈঠকখানায় যে লোভনীয় মজলিসী-মেজাজ বিদ্যমান ছিল আমার মনে হয় বিমলাপ্রসাদ তার শেষ উত্তরাধিকারী। "অন্যভুবন"-এর ভূমিকায় সেই রুচিমান বৈঠকী মেজাজের পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছি।

এই সংকলনের একটি পরম মূল্যবান সম্পদ পরিশিষ্টে সংযোজিত ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'আমাদের সাহিত্যে ভূতের গল্প' প্রবন্ধটি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত 'ভূতকথা'র একটি অতি-মনোজ্ঞ তথ্যপূর্ণ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এখানে উদাহৃত হয়েছে। শেষকথায় বিমলাবাবুকে বইখানি সম্পাদনার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করি।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

নৈমিষারণ্য—বিকর্ণ। বাক্-সাহিত্য। কলিকাতা ৯। মূল্য ৯·৫০

নৈমিষারণ্য গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন অরণ্যভূমি। একদা ঋষি-ম আবাস ছিল এখানে, গৌরমুখ মুনি এখানে নিমেষকালের মধ্যে অসুর সৈন্য ভস্মীভূত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল নৈমিষারণ্য। লেখক বলেছেন, কলিযুগের মানুষের সে মন্ত্রশক্তি নাই যাতে আসুরিক প্রভাবকে নিমেষমধ্যে নির্মূল করা যায়, তবু গ্রন্থের এই নামকরণের মধ্যেই তিনি ইচ্ছাপূরণের এক তির্যকতৃপ্তি খুঁজেছেন।

কিন্তু নৈমিষারণ্যের আরও একটি কারণে খ্যাতি আছে। এই অরণ্যভূমিতে সমবেত ঋষিদের নিকট সৌতি মহাভারত পাঠ করেছিলেন। লেখক সে কথার উল্লেখ করেন নি। আমার কিন্তু মনে হয়—তাঁর তির্যক তৃপ্তির চেয়েও গভীরতর তৃপ্তির কারণ ঘটেছে আমরা তাঁর এই নৈমিষারণ্যে নব মহাভারতের কাহিনী শুনলাম। লেখকের নাম বিকর্ণ না হয়ে 'সৌতি' হলে আরও মনোজ্ঞ হতে পারত।

কিন্তু 'বিকর্ণ' নামটিও কম অর্থবহ নয়। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে বিকর্ণ একজন। বিকর্ণ দুর্যোধন দুঃশাসনের সহোদর হয়েও তাদের মত নিষ্ঠুর ও খলপ্রকৃতির ছিলেন না, বরং তাঁকে গান্ধারীর উপযুক্ত অঙ্গজ বলা চলে। কৌরব রাজসভায় যখন দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাস্ত হন এবং নিজে বিজিত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ ধরেন তখন দ্রৌপদী যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রকৃতপক্ষে বিজিত হননি এ সত্য সাহস করে একমাত্র বিকর্ণই বলেছিলেন। সত্যভাষণের এই দৃষ্টান্ত, সেই সৎসাহস বর্তমান লেখকেরও আছে। তাই তাঁর নাম সৌতি' না হয়ে 'বিকর্ণ' হওয়ায় আরো বেশি অর্থবহ হয়েছে সন্দেহ নেই।

নামেই কি বা আসে যায়? মনে হয় উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশকালে নাম স্থির হয়েছিল—'আবাদ করলে'। দেশ-বিভাগের মত এমন একটা দুঃস্বপ্নের ঘটনা যখন বাস্তব হয়ে উঠল, ছিন্নমূল নরনারীর ভাসমান জীবন, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ এবং দুর্বার প্রাণশক্তির স্পর্শে কোনও মহৎ সাহিত্য বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হল না কেন তা নিয়ে আফশোসের সীমা নেই। জানি না শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে আমাদের আশা পূর্ণ করতে শেষ বয়সে তিনি কলম ধরতেন কিনা। তথাকথিত বিখ্যাত বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকেরা এই বৃহৎ পটভূমিকার উপর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তাই বলে এই বিরাট বিষয়টি বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের সহানুভূতির দৃষ্টি একেবারেই এড়িয়ে গেছে একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। ছোট গল্পের মাধ্যমে অনেক সার্থক প্রয়াস হয়েছে, উপন্যাসের মাধ্যমেও এই ঘটনার নানা আবর্ত-চিত্র বিধৃত হয়েছে।

বিকর্ণের "নৈমিষারণ্য" পড়ে নানাদিক দিয়ে ভাবতে হয়। ৫১৯ পৃষ্ঠার বৃহদাকার

উপন্যাস, তার রচয়িতা কোন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক নন, লেখক যে কারণেই হোক নিজেকেও ছদ্মনামের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, কিন্তু লেখার ভাবে ভাষায় ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্তিতে সর্বোপরি এক মহৎ অভীপ্সায় লেখকের বৈদগ্ধ, অনুপ্রাণিত উন্মাদনা এবং উচ্চাশা নিঃসংশয়ে উচ্চারিত হয়েছে। "শ্রীকান্তে"র রচয়িতা যখন "শেষ প্রশ্ন" লেখেন তখন বুঝতে পারি সেই লেখার প্রস্তুতি ছিল। "কালিন্দী"-লেখা কলমে "আরোগ্যনিকেতন" রচিত হলে আমরা বিস্মিত হই না। কিন্তু যে লেখক উদ্বাস্তু বসতির সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে নৈমিষারণ্য লিখে নিজেকে প্রকাশের যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি পেতে চান, তার দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারি না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি বাংলার মানসভূমিতে যে পলিমাটি বিস্তার করেছে সেখানেই একটি উড়ে আসা (উদ্বাস্তু?) বীজেও এমন মহীরুহ জন্মাতে পারে। "নৈমিষারণ্য" তাঁর প্রথম লেখা হলে বলতে হবে--আমাদের উপন্যাসের ভবিষ্যৎ আছে। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বনফুলেই বাংলা ভাষায় সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি থেমে থাকে নি। মাসে মাসে ঝুড়ি ঝুড়ি যে সব ফরমায়েসী উপন্যাসের আবর্জনা জমা হচ্ছে তার পচাসারের উপরে এমন দু'-একটি নৈমিষারণ্যের অক্ষয়বট যদি গজায় তবে আমাদের আর হতাশ হবার কারণ থাকবে না।

ইচ্ছা করেই "নৈমিষারণ্যে"র কাহিনীর অরণ্যে প্রবেশ করব না। পাঠককে অনুরোধ করব লেখকের বক্তব্য জানবার জন্য গোটা উপন্যাসখানি পড়তে। অনেক বিষয়ে জানবার, ভাববার এবং করবার আছে। সমস্যাটা তো কেবল যারা উদ্বাস্তু তাদেরই নয়, সমস্যা গোটা দেশ তথা দেশবাসীর, আপনার আমার সকলেরই সমস্যা, সকলেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

"নৈমিষারণ্যে"র ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। উদ্বাস্তুদের মুখে পূর্ববঙ্গের ভাষার নমুনা কোন কোন পাঠকের কানে মধুবৃষ্টি করতে থাকে। যারা দেশ ছেড়েছে, ঘর বাড়ি স্থাবর অস্থাবর সব ছেড়েছে তারাও কিন্তু ছাড়েনি তাদের মুখের ভাষা। জীবন দেবে তবু জবান দেবে না—এই যেন পণ করেছে তারা। কিন্তু এ পণ নতুন পরিবেশে নতুন দেশে কতদিন বজায় থাকবে কে জানে? হয়ত উত্তরপুরুষের মুখে আর সেই অবিমিশ্র নিখাঁদ আঞ্চলিক টানটুকু, ক্রিয়াপদের স্বকীয় গঠনটুকু, সর্বনামের সাবলীল রূপটুকু উবে যাবে। "নৈমিষারণ্য" উপন্যাসে অকৃত্রিম নিষ্ঠায় সঞ্চিত, ফেলে-আসা গ্রামের শেষ স্মৃতির সার্থক দলিল হয়ে রইবে তার পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা।

সন্তোষকুমার দে

বিবিধার্থ অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এতে স্থান পেয়েছে বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশ, প্রবাদ ও প্রবচন, দেব-দেবী, নাম স্থান ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বিশিষ্টার্থক শব্দ ও প্রবাদ; বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ, বাংলায় প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ; বৃহৎবাচক ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ; উপচর বা বিকার শব্দ; বিপরীতার্থক যুগ্ম শব্দ; বিভিন্ন শব্দ, আওয়াজ, ডাক ইত্যাদি; রাজনৈতিক সাংবাদিক ইত্যাদি পরিভাষা;

বাংলা শব্দের বিকৃত বা গ্রাম্যরূপ; যুদ্ধোত্তর নতুন বাংলা কথা; ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ; বাংলা অশিষ্ট বা অপশব্দ এবং বিবিধ বিষয়ের পরিভাষা। এতে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় পনেরো হাজার শব্দ, প্রবচন ইত্যাদি।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে সম্পাদক যে-সব শব্দ ও শব্দ-সংশ্লেষ সংগ্রহে হাত দিয়েছেন তা আমাদের, বিশেষ করে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের, দৈনন্দিন জীবনে খুব প্রয়োজনীয়। আমাদের দুই-একটি সুপরিচিত অভিধানে এইসব শব্দ ও শব্দ-সংশ্লেষ কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সে-সব অনেকে সহজপ্রাপ্য হয়েছে এই বইটিতে, সেজন্য বইখানি এর মধ্যে নবীন শিক্ষার্থীদের অনেকটা প্রিয় হয়েছে।

বইখানির সর্বত্র সম্পাদকের শ্রমের ও বিচারবোধের পরিচয় রয়েছে। সেজন্য তিনি আমাদের অকৃত্রিম সাধুবাদের পাত্র। অবশ্য এই ধরনের গ্রন্থ পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে প্রথম মুদ্রণে নয়, পর পর কয়েকটি সযত্ন মুদ্রণের ফলে। আমাদের ভরসা আছে বইখানির সেই সৌভাগ্য লাভ হবে। সেই উদ্দেশ্যে এতে এখানে-ওখানে যে-সব ছোটোখাটো ভুলত্রুটি আমাদের চোখে পড়েছে তার উল্লেখ করা সংগত মনে করি।

২৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'গলা টিপলে দুধ বেরোয়', কিন্তু কথাটা বোধ হয় হবে, 'গাল টিপলে দুধ বেবোয়'; গলাটেপার অর্থ কণ্ঠরোধ করা।

৪৯ পৃষ্ঠায় কলমধরা-র অর্থ লেখা হয়েছে 'লিখিতে বসা'; তার সঙ্গে যোগ করা দরকার 'কোনো বিষয় প্রতিপন্ন করিতে বা কাহারও মতের প্রতিবাদে'।

১১৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'গাজী সাহেবের মোরগ পেটে গেলেও হাঁক দেয়', হবে ......বাঁক দেয়।

১৪৩ পৃষ্ঠায় আলম-এর অর্থ লেখা হয়েছে 'বিদ্বানলোক'; হবে, বিশ্ব। আলেকুম-এর অর্থ লেখা হয়েছে 'নমস্কার'; হবে 'আপনাদের প্রতিও'। এটি আলায়কুমুস্ সালাম-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, বাংলায় পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

১৯৫ পৃষ্ঠায় লস্কর-এর অর্থ লেখা হয়েছে 'জাহাজের নাবিক'। এটি ভুল নয়, কিন্তু লস্করের প্রাথমিক অর্থ সৈন্য বা সৈন্যদল।

১৯৭ পৃষ্ঠায় হাইকোর্ট-এর অর্থ লেখা হয়েছে 'উচ্চতম বিচারালয়'। বোধ হয় লেখা উচিত ছিল, প্রদেশের বা রাজ্যের উচ্চতম বিচারালয়।

২০১ পৃষ্ঠায় গালিচার অর্থ ভুল দেওয়া হয়েছে, হবে ছোটো কার্পেট।

২৬৫ পৃষ্ঠায় 'মিসিবাবা'র অর্থ লেখা হয়েছে 'ইউরোপীয় নারী'; বোধ হয় হবে, ইউরোপীয় অবিবাহিত নারী।

বলা বাহুল্য মাত্র কয়েকটি ভুল-ত্রুটির উল্লেখ আমরা করলাম। আরও কিছু কিছু ত্রুটি ও অসাবধানতা আমাদের চোখে পড়েছে; সে সবের উল্লেখ আর করলাম না। আমাদের চোখে পড়েনি এমন ভুল-ত্রুটিও এতে থাকা আশ্চর্য নয়। আমরা আশা করছি পরবর্তী মুদ্রণে বইখানির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন হবে ও তার ফলে এর উপযোগিতা আরো বাড়বে।

কাজী আবদুল ওদুদ